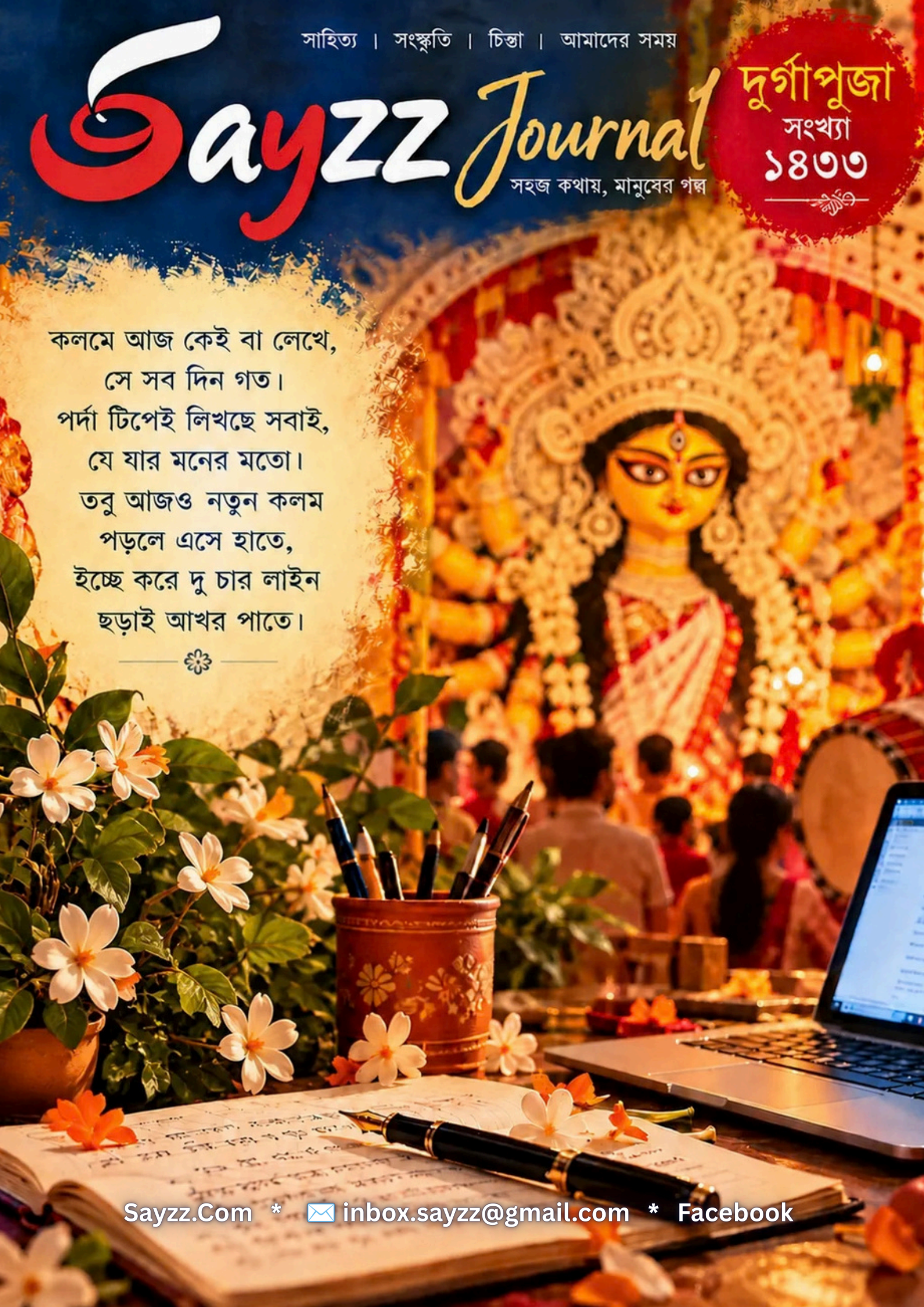
সাহিত্য । সংস্কৃতি । চিন্তা । আমাদের সময়

Sayzz Journal

সহজ কথায়, মানুষের গল্প

দুর্গাপুজা সংখ্যা ১৪৩৩



কলমে আজ কেই বা লেখে,
সে সব দিন গত।
পর্দা টিপেই লিখছে সবাই,
যে যার মনের মতো।
তবু আজও নতুন কলম
পড়লে এসে হাতে,
ইচ্ছে করে দু চার লাইন
ছড়াই আখর পাতে।

Sayzz.Com * ✉ inbox.sayzz@gmail.com * Facebook

সম্পাদকীয়

শারদীয় দুর্গাপুজো সংখ্যা ২০২৬

Sayzz Journal | চতুর্থ সংখ্যা

শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের দোলা, শিউলির সুবাস আর ঢাকের শব্দ- সব মিলিয়ে বাঙালির হৃদয়ে জেগে ওঠে এক চিরচেনা আনন্দ, দুর্গাপুজো।উৎসবের এই আবহে যেমন থাকে মিলনের উচ্ছ্বাস, তেমনই থাকে সাহিত্য, শিল্প ও সৃষ্টির এক নিবিড় টান।আর সেই টানেই শব্দের হাত ধরে আপনাদের কাছে ফিরে এল Sayzz Journal এর শারদীয় দুর্গাপুজো সংখ্যা ২০২৬।

এবার আমাদের পথচলার চতুর্থ বর্ষ।এই যাত্রা হয়তো খুব দীর্ঘ নয়, তবু এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক স্বপ্ন, কিছু সাহসী পদক্ষেপ আর বাংলা সাহিত্যকে আরও কিছু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। প্রতিটি নতুন সংখ্যার সঙ্গে আমাদের প্রত্যাশাও একটু একটু করে বেড়েছে। আরও নতুন লেখা, আরও নতুন মুখ, আরও বেশি পাঠকের ভালোবাসা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি লেখা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা লেখকের মনের গণ্ডি পেরিয়ে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছায়। তাই Sayzz Journal-এর কাছে পত্রিকা প্রকাশ শুধু কিছু লেখা একত্রিত করা নয়; বরং লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি সেতু গড়ে তোলা, যার দুই প্রান্তে থাকবে সৃষ্টির আনন্দ আর পাঠের অনুভব।

যাঁরা নিভৃতে কবিতা লেখেন, গল্পের চরিত্রদের বাঁচিয়ে রাখেন মনের মধ্যে, কিংবা জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা শব্দে সাজিয়ে তোলেন- তাঁদের সকলের জন্যই আমাদের এই মঞ্চ।আমরা চাই, নবীন লেখকের প্রথম প্রকাশিত লেখাটিও পাক যথাযথ মর্যাদা, আর পাঠকেরা খুঁজে পান এমন সব সৃষ্টি, যা তাঁদের ভাবাবে, আনন্দ দেবে এবং মনের কাছে টেনে নেবে।

আমাদের আগের সংখ্যাগুলিও আপনাদের জন্য রয়ে গেছে sayzz.com-এর Journal বিভাগে। সময় করে সেগুলিও পড়ুন, পছন্দের লেখা ভাগ করে নিন প্রিয়জনদের সঙ্গে।আপনাদের পাঠ, মতামত ও ভালোবাসাই আমাদের এগিয়ে চলার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

এই শারদীয় উৎসবে সকল লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।মায়ের আগমনে সবার জীবন ভরে উঠুক আনন্দ, শান্তি ও নতুন স্বপ্নে।নতুন লেখার জন্ম হোক, নতুন পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হোক, আর সাহিত্য আমাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসুক।

আপনাদের লেখা, আপনাদের পাঠ আর আপনাদের ভালোবাসা- এই তিনকে সঙ্গী করেই Sayzz Journal এগিয়ে চলুক।

শুভ শারদীয়া।

সস্নেহে,

ইপ্সিতা সরকার

সম্পাদক (Sayzz Journal)

সূচিপত্র



কলমে আজ কেই বা লেখে (প্রচ্ছদ কবিতা) | সায়ান দাশগুপ্ত



সম্পাদকীয় | ইপ্সিতা সরকার



দুর্গাপুজো বনাম শারদীয় উৎসব | অমলকান্তি ১



শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্জলী যাত্রা | শুভায়ন মিত্র ৪



জিজ্ঞাসা | সুজাতা দাস ৫



তারাপীঠের পথে | রাজদীপ ঘোষ ৬



চিলেকোঠার গুপ্তধন | ময়ুখ দাস ১১



শিকার ও শিকারী | তিয়াসা দত্ত ১৪



ডান : অশ্বত্থতলার কালো ছায়া | সুদীপ্ত হেমব্রম ১৫



"আগুনেরও ছুটি" | গৌতম দাস ২৪



আত্মচিৎকার | অঙ্কুশ অধিকারী ২৯



দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য মিরর | ইয়াসমিন মন্ডল ৩০

সূচিপত্র -- ২



শৈত্যপুরী | সুচন্দ্রিতা ঘোষাল চক্রবর্তী ৪৩



কৃষ্ণ বিবর | বিজয়ে দাস ৪৬



মানসিকতা | অয়ন দাস ৪৮



ভূত চতুর্দশী | তানিশা ও রাজ ৪৯



যে মেয়েটি হার মানেনি | পিউ মণ্ডল ৫১

দুর্গাপুজো বনাম শারদীয় উৎসব

[একই আনন্দের দুই ভিন্ন পরিচয়]

আমলকান্তি

শরতের নীল আকাশ, সাদা কাশফুল, শিউলির মিষ্টি গন্ধ আর দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ -এই সবকিছু মিলিয়েই বাঙালির মনে জেগে ওঠে এক বিশেষ অনুভূতি। সেই অনুভূতির নাম দুর্গাপুজো।

কিন্তু দুর্গাপুজো আর শারদীয় উৎসব কি একই কথা?

দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা প্রায়ই 'দুর্গাপুজো', 'শারদীয় উৎসব' এবং 'শারদোৎসব' -এই শব্দগুলি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, শব্দগুলির অর্থ ও পরিসরে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

দুর্গাপুজো মূলত দেবী দুর্গার আরাধনা। আর শারদীয় উৎসব হলো সেই পুজোকে কেন্দ্র করে শরৎকালে গড়ে ওঠা বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আনন্দের পরিসর।

একটিতে রয়েছে ভক্তি ও ধর্মীয় আচার, অন্যটিতে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের মিলন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কেনাকাটা, ভ্রমণ, স্মৃতি ও আনন্দ। তাই 'দুর্গাপুজো বনাম শারদীয় উৎসব' আসলে কোনও প্রতিযোগিতা নয়; বরং একই ঐতিহ্যের দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত পরিচয়।

দুর্গাপুজো: ভক্তি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মিলন

দুর্গাপুজো বাঙালির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার কাহিনি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

শারদীয় দুর্গাপুজোর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ের নিজস্ব ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। ষষ্ঠীর বোধন, সপ্তমীর নবপত্রিকা স্নান, অষ্টমীর অঞ্জলি ও সন্ধিপুজো, নবমীর পূজা এবং দশমীর বিসর্জন, সব মিলিয়ে তৈরি হয় একটি দীর্ঘ ধর্মীয় পরম্পরা।

তবে দুর্গাপুজো কেবল মন্ত্র, পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক পুজো, বনেদি বাড়ির ঐতিহ্য, আত্মীয়স্বজনের মিলন, নতুন পোশাক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা রীতিনীতিও দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থাৎ, দুর্গাপুজোর কেন্দ্রে রয়েছে দেবী ও তাঁর আরাধনা, কিন্তু সেই আরাধনাকে ঘিরেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে একটি বৃহত্তর সামাজিক জগৎ।

'শারদীয়' শব্দের অর্থ কী?

'শারদীয়' শব্দটির মূল 'শরৎ'। অর্থাৎ, শরৎকালের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও বিষয়কে 'শারদীয়' বলা যায়।

এই অর্থে 'শারদীয়' শব্দটি শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর জন্য নির্দিষ্ট নয়। শরৎকালের সাহিত্য, উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা বিশেষ প্রকাশনাকেও 'শারদীয়' বলা যেতে পারে।

বাংলা সংস্কৃতিতে অবশ্য 'শারদীয়' শব্দটি ধীরে ধীরে দুর্গাপুজো এবং পুজোকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে যে আজ 'শারদীয় সংখ্যা' বললেই সাধারণত পুজোর বিশেষ সাহিত্যসংখ্যার কথাই মনে পড়ে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, 'শারদীয়' শব্দের প্রথম ব্যবহার এবং 'শারদীয় পুজোসংখ্যা'র সূচনা একই ঘটনা নয়। এই দুটি বিষয়কে এক করে দেখলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

শারদীয় উৎসব: ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর আনন্দ

শারদীয় উৎসব বলতে সাধারণভাবে শরৎকালে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামগ্রিক উৎসবের আবহকে বোঝানো হয়। এখানে ধর্মীয় পুজোর পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক মিলন, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ফ্যাশন, আলোকসজ্জা, মণ্ডপসজ্জা, ভ্রমণ, কেনাকাটা এবং বিনোদন। পাড়ার মণ্ডপ থেকে বড় শহরের থিমপুজো সব জায়গাতেই দেখা যায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কেউ আসেন প্রার্থনা করতে, কেউ প্রতিমা দেখতে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে, আবার কেউ শুধুই শহরের উৎসবের আবহ উপভোগ করতে।

এই বহুমাত্রিকতাই শারদীয় উৎসবকে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিণত করেছে।

দুর্গাপুজো ও শারদীয় উৎসবের পার্থক্য কোথায়?

দুটি শব্দকে পাশাপাশি রাখলে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

১. উদ্দেশ্যের পার্থক্য

দুর্গাপুজোর প্রধান উদ্দেশ্য দেবী দুর্গার আরাধনা ও ধর্মীয় আচার পালন। অন্যদিকে, শারদীয় উৎসবের পরিসর অনেক বড়। সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানুষের মিলন, আনন্দ, সংস্কৃতি ও বিনোদনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২. পরিসরের পার্থক্য

দুর্গাপুজো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব। শারদীয় উৎসব তার চেয়ে বিস্তৃত একটি ধারণা। এর মধ্যে পুজো, মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কেনাকাটা, ভ্রমণ এবং সামাজিক মিলনের মতো বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. অংশগ্রহণের পার্থক্য

দুর্গাপুজোর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মূলত হিন্দু ধর্মীয় পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শারদীয় উৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন। মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন, আলোকসজ্জা উপভোগ কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় অনেক সময় কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

৪. অনুভূতির পার্থক্য

দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা। অন্যদিকে, শারদীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বন্ধুত্ব, পারিবারিক মিলন, নস্টালজিয়া এবং শৈশবের স্মৃতি।

‘অকালবোধন’ থেকে আজকের শারদীয় দুর্গাপুজো

বাংলায় শরৎকালের দুর্গাপুজোকে অনেক সময় ‘অকালবোধন’ বলা হয়। প্রচলিত ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কাহিনিতে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার সঙ্গে এই অকালবোধনের গল্প জড়িয়ে আছে। তবে এখানে একটি ঐতিহাসিক সতর্কতা জরুরি। রামের অকালবোধনের জনপ্রিয় কাহিনি পরবর্তী বাংলা সাহিত্য ও লোকপরম্পরায় অত্যন্ত পরিচিত হলেও বাল্মীকি রামায়ণে এই কাহিনি একইভাবে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পুরাণ ও আঞ্চলিক ধর্মীয় পরম্পরায় দুর্গার বোধন ও শরৎকালের পূজার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই অকালবোধনকে শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়, বাংলার ধর্মীয় ও সাহিত্যিক সংস্কৃতির দীর্ঘ বিবর্তনের অংশ হিসেবেও দেখা যায়।

পারিবারিক পুজো থেকে সর্বজনীন পুজো

বাংলায় দুর্গাপুজোর ইতিহাসে পারিবারিক ও বনেদি বাড়ির পুজোর পাশাপাশি বারোয়ারি এবং সর্বজনীন পুজোর বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একসময় বড় পরিবার, জমিদার বা বনেদি বাড়ির পুজো ছিল সামাজিক মর্যাদা ও ঐতিহ্যের অন্যতম প্রকাশ। পরবর্তী সময়ে পাড়াভিত্তিক বারোয়ারি ও সর্বজনীন পুজো আরও বেশি মানুষকে উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়। আজকের শারদীয় উৎসবের সর্বজনীন চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শারদীয় পুজোসংখ্যার ইতিহাস

বাঙালির শারদীয় সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো পুজোসংখ্যা বা শারদীয় সাহিত্যসংখ্যা। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকাশনা বের করার ইতিহাস উনিশ শতকেই শুরু হয় বলে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশিত সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

‘ছুটির সুলভ’: পথিকৃতের ভূমিকা

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘সুলভ সমাচার’-এর সঙ্গে যুক্ত ‘ছুটির সুলভ’ নামে একটি বিশেষ সংখ্যা ১৮৭২–৭৩ সালের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক লেখক ও গবেষক এটিকে বাংলা পুজোসংখ্যার প্রাথমিক পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করেন। তৎকালীন এই বিশেষ প্রকাশনার উদ্দেশ্য ছিল মূলত পুজোর ছুটিতে পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় পাঠ্য উপাদান সরবরাহ করা। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের বিশেষ সংখ্যার ধারণা আরও বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ, ১৮৭০-এর দশককে বাংলা পুজোসংখ্যার প্রাথমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে ধরা যায়।

১৯১৩: 'ভারতবর্ষ' এবং পূর্ণাঙ্গ শারদীয় সংখ্যার নতুন অধ্যায়

পুজোসংখ্যার ইতিহাসে ১৯১৩ সাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাময়িকপত্র 'ভারতবর্ষ'-এর ১৯১৩ সালের কার্তিক সংখ্যা বহু গবেষণা ও লেখায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা শারদীয় সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার এবং তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের উপস্থিতি এই সংখ্যাটিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।

শারদীয় উৎসব ও বাঙালির সাহিত্যপ্রেম

পুজোর সঙ্গে বই ও সাহিত্যকে যুক্ত করার এই ঐতিহ্য বাংলা সংস্কৃতির এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুজোর আগে নতুন পোশাক কেনার মতোই নতুন বই বা পুজোসংখ্যা কেনার অপেক্ষাও বহু বাঙালির কাছে উৎসবের অংশ হয়ে উঠেছিল।

বাড়িতে পুজোর ছুটিতে গল্প-উপন্যাস পড়া, ছোটদের জন্য পূজাবার্ষিকী কেনা, আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে নতুন বই নিয়ে আলোচনা, এসব মিলিয়ে শারদীয় উৎসবের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।

আজ ডিজিটাল মাধ্যমের যুগে মুদ্রিত পুজোসংখ্যার পাশাপাশি ই-বুক, অনলাইন ম্যাগাজিন ও ডিজিটাল কনটেন্টও সেই ঐতিহ্যকে নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধর্মীয় উৎসব থেকে সর্বজনীন সংস্কৃতি

শারদীয় উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এর সামাজিক সর্বজনীনতা।

দুর্গাপুজোর ধর্মীয় আচার হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হলেও পুজোকেন্দ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আনন্দে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই কারণেই কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্গাপুজো আজ শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক হিসেবেও পরিচিত।

তবে 'সর্বজনীনতা' বলতে ধর্মীয় পার্থক্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়া বোঝায় না। বরং বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষ পাশাপাশি থেকে একটি সামাজিক উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন, এটাই এর বিশেষত্ব।

দুর্গাপুজো বনাম শারদীয় উৎসব: আসলে কি কোনও 'বনাম' আছে?

আসলে নেই। দুর্গাপুজো এবং শারদীয় উৎসবকে পরস্পরের বিপরীতে দাঁড় করানো অনেকটাই কৃত্রিম। দুর্গাপুজো হলো কেন্দ্র। শারদীয় উৎসব হলো সেই কেন্দ্রকে ঘিরে তৈরি হওয়া বৃহত্তর বৃত্ত। দুর্গাপুজো ছাড়া বাংলার শারদীয় উৎসবের বর্তমান রূপ কল্পনা করা কঠিন। আবার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ ছাড়া দুর্গাপুজোও আজকের এই বিশাল উৎসবের রূপ পেত না।

একদিকে দেবীর আরাধনা, অন্যদিকে মানুষের মিলন, এই দুইয়ের সম্মিলনেই তৈরি হয়েছে বাংলার শারদীয় সংস্কৃতি।

দুর্গাপুজো আমাদের ভক্তির আশ্রয়।
শারদীয় উৎসব আমাদের মিলনের আনন্দ।

তাই দুর্গাপুজো আর শারদীয় উৎসবকে আলাদা করে দেখার চেয়ে বলা যায়--
দুর্গাপুজো হলো আরাধনার প্রাণ, আর শারদীয় উৎসব সেই আরাধনাকে ঘিরে মানুষের আনন্দ, শিল্প, সাহিত্য ও মিলনের বৃহত্তর প্রকাশ। শরতের আকাশে যখন সাদা মেঘ ভেসে যায়, কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে আর দূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসে, তখন বাঙালি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবের অপেক্ষা করে না।

= = সমাপ্ত = =

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্জলী যাত্রা

লেখক - শুভায়ন মিত্র
প্রধানশিক্ষক খলিসানী বিদ্যামন্দির

সম্প্রতি আমরা পেরিয়ে এলাম পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬ তম জন্মদিবস। সরকারি নির্দেশের চাপে পড়ে বিদ্যালয়গুলিতে স্মরণ করা হলো প্রাতঃ স্মরণীয় এই ব্যক্তিত্বকে । নির্দেশ ছাড়া তো আমরা আমাদের অন্তরের তাগিদ থেকে এইসব মনীষীদের স্মরণ করতে ভুলেই গেয়েছি অথচ পরাধীন বাংলায় ,অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলায় যদি কেউ শিক্ষার আলো জ্বেলে থাকেন, তিনি হলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর একদা এক বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন যে "বিদ্যালয়গুলি ইট , কাঠ, লোহা, সিমেন্টের তৈরী বাড়ি হলেও তা সাধারণের চোখে বাড়ি নয় কারণ ওই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাণের স্ফূরন হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় আর সমাজ তৈরীর ভিত্তি তৈরি হয়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি হয়, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে"।

অথচ আজ বলতে কোন দ্বিধা নেই সরকারি সদিচ্ছার অভাবে পশ্চিমবাংলার প্রান্তে প্রান্তে বিদ্যালয়গুলির অবস্থা মারাত্মক রকমের করুণ । দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত, রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তাদের স্বার্থে পরিচালিত। যদি শিক্ষাবিদদের দ্বারা বা শিক্ষার সহিত যুক্ত প্রকৃত আগ্রহীদের মাধ্যমে বিদ্যালয় গুলি পরিচালিত হতো তাহলে বিদ্যালয়গুলি অবশ্যই অন্যরকম হতো। প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন গুলি শিক্ষকের অভাবে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়াতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েগুলিতে যে সরবরাহ লাইন সেটা আজ বিচ্ছিন্ন । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সারা বছর অন্য সরকারি কাজে যুক্ত করে নেওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তারা শিশুদের পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োগ করতে পারছেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই দুরবস্থার জন্যই সাধারণ মানুষরাও আস্থা রাখতে পারছে না বিদ্যালয়ের উপর। হাজার কষ্ট করে হলেও তারা নির্ভর করছে ইংরেজি মাধ্যমে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির উপর। শিক্ষার বেসরকারি করনের সূত্রপাত এখান থেকে শুরু। মেধার থেকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে একদম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর অবধি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে । সঠিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হচ্ছে । তার উপর যাও বা আছে সেটা নষ্ট হতে বসেছে বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে সারা বছর বিভিন্ন সরকারি সমাজসেবামূলক প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে । যার ফলে পড়াশোনা ক্রমশঃ গৌণ হয়ে পড়েছে । ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ, মিড ডে মিল, জামা, জুতো , ব্যাগ , বই - খাতা পাওয়ার জন্য, বিনিময়ে কিছু দেওয়ার জন্য নয়। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের জয়গান করার জন্যই যদি বিদ্যালয় হয় তাহলে আসল জায়গায় বিরাট ফাঁকি হয়ে যায়। বিগত দীর্ঘ সময় ধরে এগুলো চলতে থাকায় বিদ্যালয় আজ আর জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষতার কেন্দ্র আর নেই ।

আর নেই বলেই আজ সমাজেও তার প্রতিচ্ছবি । বর্তমান সমাজ অবক্ষয় ভরা , মানবিক গুণ প্রায় তলানিতে পৌঁছনো এক জড় মাধ্যমে আজ পরিণত । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শিক্ষায় সবার সমান অধিকার" , "নারীশিক্ষাই আমার অগ্রাধিকার" এইসব ধ্যান-ধারণাগুলো খাতায়-কলমে রয়ে যাচ্ছে, তার মৃত্যুর প্রায় ১৩৫ বছর পরেও কোন বাস্তবিক প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না।

= = **সমাপ্ত** = =

জিজ্ঞাসা

সুজাতা দাস

আমি ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম,
চেয়েছিলাম একটু ভালোবাসতে।
স্বপ্নের ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিলাম,
চেয়েছিলাম ভালো থাকতে।
একটা পাশে ভালো মানুষ চেয়েছিলাম,
চেয়েছিলাম একটু ভালোভাবে বাঁচতে।
জীবনে পাইনি কিছুই আমি,
হাতটি ধরে কেউ বলেনি—
“আমি তো আছি, ভেবো নাকো তুমি।”
সবাই আমায় নিয়ে করেছে খেলা—
হয়েছি সবার প্রয়োজন।
কেউ করেনি সাথী আমায়,
হতে পারিনি কারও প্রিয়জন।
পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে
আমার একটাই নিবেদন—
আর অবহেলা করো না আমায়,
করো গো একটু আপন।
তোমাদের কাছে প্রশ্ন আমার—
ছিল না কি মোর
একটু ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার?
এইভাবে ভালোবাসা পাওয়ার প্রতীক্ষা করতে করতে
স্তব্ধ হয়ে যাবে আমার হৃদয়স্পন্দন।
শূন্য হয়ে যাবে এই স্বর্ণকানন,
আর কেউ বলবে না—
“পৃথিবীর মানুষ, আমায় একটু ভালোবাসো।”
বলবে না কেউ—
“আমি তোমার,
তুমিও পাশে এসো।”



আমরা তিন বন্ধু – সুমন, রাজদীপ আর সুদীপ্ত। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমরা তিনজন একটি গাড়িতে করে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল। একটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। রাস্তার দুপাশে শুধু মাঠ, আর চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার ওপর রাস্তার পাশেই ছিল একটি শ্মশান। নিস্তব্ধ রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনে এমনিতেই গা ছমছম করছিল।

হঠাৎ মনে হলো, গাড়ির ছাদের ওপর যেন কিছু একটা এসে পড়ল।

ঠাস!

শব্দটা এত জোরে হলো যে আমরা তিনজনই চমকে উঠলাম।

সুদীপ্ত বেশ সাহসী ছেলে। সে বলল,

—"গাড়িটা থামা। মনে হচ্ছে, গাড়ির ওপর কিছু একটা নড়াচড়া করছে। নেমে দেখে আসি।"

সুমন সঙ্গে সঙ্গে বলল,

—"না, না! আমি গাড়ি থেকে নামব না। আমার খুব ভয় করছে।"

সুদীপ্ত হেসে বলল,

—"আরে, এত ভয় পাচ্ছিস কেন? চল, আমরা নেমে দেখি। তুই তো খুব ভীতু হয়ে গেছিস!"

আমি আর সুদীপ্ত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চারপাশটা ভালো করে দেখলাম। কিন্তু গাড়ির ছাদে বা আশেপাশে কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন সুমনের ভয় একটু কমল।

আমি বললাম,

—"যে জিনিসটা গাড়ির ছাদে পড়েছিল, সেটা হয়তো গাছের ডাল হতে পারে। আবার কেউ হয়তো ঢিল বা পাথরও ছুড়ে থাকতে পারে।"

সুমন বলল,

—"না, সেটা কী করে হবে? এই রাস্তাটা তো শ্মশানের পাশ দিয়ে গেছে। এখানে তো আশেপাশে কোনো বাড়িই নেই!"

সুদীপ্ত বলল,

—"আচ্ছা, এসব পরে ভাবা যাবে। আগে গাড়িটা স্টার্ট কর।"

সুমন গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করার চেষ্টা করল। কিন্তু গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট নিল না। কয়েকবার চেষ্টা করার পরেও যখন গাড়ি স্টার্ট হলো না, তখন সুদীপ্ত বলল,

—"চল, নেমে দেখি কী হয়েছে।"

সুমন ভয়ে গাড়ির মধ্যেই বসে রইল। সে বলল,

—"তোরা যা। আমি এখানেই আছি। আমার খুব ভয় করছে।"

সুদীপ্ত আর আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

সুদীপ্ত বলল,

—"চল, গাড়ির ইঞ্জিনটা একবার দেখি।"

ইঞ্জিনের ব্যাপারে সুদীপ্তর তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না। তাই আমি বললাম,

—"তুই থাক, আমি দেখছি।"

সুদীপ্ত ফোনের টর্চ জ্বেলে গাড়ির বনেটের কাছে আলো ধরল। আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম, গাড়িতে তেমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। পেট্রল ঠিকঠাক আছে, জলও আছে। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট না নেওয়ার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি আর সুদীপ্ত মিলে গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার এক পাশে নিয়ে এলাম।

এসব দেখে সুমন আরও ভয় পেয়ে বলল,

—"ভয় লাগছে রে!"

সুদীপ্ত বিরক্ত হয়ে বলল,

—"কিসের ভয়? একটু চুপ করে থাক তো!"

সুমন বলল,

—"ভয় না পেয়ে আমি কী করব? এমন নির্জন জায়গায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে!"

আমি বললাম,

—"চল, আমরা একটু সামনে গিয়ে দেখি কোনো গ্যারেজ বা দোকান পাওয়া যায় কি না।"

কিন্তু তখনই আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। আমাদের তিনজনের কারো ফোনেই ফোন নেটওয়ার্ক ও ছিল না। ফলে ফোন করে কারও সাহায্য নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবু আমি আর সুদীপ্ত কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছাকাছি কোনো গ্যারেজ বা দোকান পেলাম না। বাধ্য হয়ে আমরা আবার গাড়ির কাছে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখি, সুমন ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে করে গাড়ির ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

সুদীপ্ত তাকে বলল,

—"কী হয়েছে? এমন করে বসে আছিস কেন?"

সুমন কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই হঠাৎ—

গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেল!

আমরা তিনজনই অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুদীপ্ত বলল,

—"গাড়ি যখন স্টার্ট হয়েই গেছে, তখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? চল, এবার রওনা দিই।"

সুমনও আর কিছু বলল না। আমরা দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়লাম। তারপর ধীরে ধীরে আবার তারাপীঠের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

অনেকটা পথ আসার পর রাত প্রায় বারোটা বাজল। সুদীপ্তর খুব খিদে পেয়ে গেল। কিছুটা এগিয়ে আমরা রাস্তার ধারে একটি ধাবা দেখতে পেলাম। গাড়ি থামিয়ে আমরা তিনজন সেখানে খেতে বসলাম।

খাওয়ার সময় একজন বুড়ো লোক আমাদের কাছে এসে বলল,

—"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

সুদীপ্ত বলল,

—"তারাপীঠের দিকে যাচ্ছি। একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।"

বুড়ো লোকটি আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,

—"এই রাস্তাটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর বিপদ জনক। রাতে যারা এই রাস্তা দিয়ে গেছে, তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি।"

কথাটা শুনে আমরা তিনজনই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

সুমন আস্তে করে বলল,

—"শুনলি তো? আমি বলেছিলাম, এই রাস্তা ভালো না!"

সুদীপ্ত হেসে বলল,

—"আরে, এসব কথায় কান দিস না। হয়তো লোকটা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা বুড়োর কথায় খুব একটা পাত্তা না দিয়ে আবার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই বুড়ো লোকটি আমাদের ডাকল।

—"এই যে! দাঁড়াও!"

আমরা তিনজন একসঙ্গে ফিরে তাকালাম।

—"কী বলছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ো লোকটি গম্ভীর মুখে বলল,

—"এই রাস্তায় যদি কেউ তোমাদের নাম ধরে ডাকে, তাহলে তার দিকে তাকাবে না।"

কথাটা শুনে সুমনের মুখ আবার ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সুমন বলল,

—"চল, আমরা বাড়ি ফিরে যাই। যখন থেকে বেরিয়েছি, তখন থেকেই একটার পর একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।"

সুদীপ্ত বলল,

—"না। এত কষ্ট করে যখন বেরিয়েছি, তখন শ্মশান পেরিয়ে তারাপীঠ না ঘুরে বাড়ি ফিরব না।"

আমি বললাম,

—"চল তো, আর দেরি করিস না।"

ভয়ে ভয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

রাস্তার দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা। কোথাও কোনো মানুষ নেই। চারপাশে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। এমন পরিবেশে যে কারও ভয় লাগতে পারে।

কিছুক্ষণ পর সুদীপ্ত বলল,

—"বাহ! রাস্তাটা কিন্তু বেশ ভালো!"

সুমন বলল,

—"চুপ কর। ফাঁকা রাস্তা হলেও দেখতে সুন্দর। ভয় লাগছে ঠিকই, তবে ভালোও লাগছে।"

আমরা গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একটা শব্দ পেলাম।

ভটভট.. ভটভট..

মনে হলো, কেউ যেন মোটর সাইকেল চালিয়ে আমাদের পেছন থেকে আসছে।

সুমনের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

—"তোরা শুনতে পাচ্ছিস?" সুমন ফিসফিস করে বলল।

সুদীপ্ত বলল,

—"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটা মোটর সাইকেলের শব্দ।"

আওয়াজটা ধীরে ধীরে আমাদের আরও কাছে আসতে লাগল।

ভটভট.. ভটভট..

আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। হঠাৎ সেই শব্দটা একেবারে মিলিয়ে গেল।

সুমন বলল,

—"কোথায় গেল?"

কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই আমাদের সামনে একটি বড়, ঘন জঙ্গল দেখা গেল। জঙ্গলটা এতটাই ঘন যে এক হাত দূরের জিনিসও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চাঁদের আলোও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গাড়ি থামিয়ে সুমন বলল,

—"চল না, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।"

এবার শুধু সুমনেরই নয়, মনে মনে আমার আর সুদীপ্তরও কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু আমরা কেউ সেটা প্রকাশ করতে চাইছিলাম না।

সুদীপ্ত বলল,

—"না। এত দূরে যখন এসেছি, এই জঙ্গল পার হয়েই যাব।"

সুমন বলল,

—"কিন্তু যদি সত্যিই কিছু থাকে?"

সুদীপ্ত একটু চুপ করে থেকে বলল,

—"কিছু থাকবে না। ভয় পেলে চলবে না।"

আমি বললাম,

—"চল, বেশি দেরি না করে এগিয়ে যাই।"

আমরা আবার গাড়ি চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

জঙ্গলের প্রায় মাঝখানে পৌঁছাতেই হঠাৎ একটা বিকট, বীভৎস গলা শোনা গেল—

—"তোরা চলে যা!"

আমরা তিনজনই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। ড্রাইভার এর সিট্ এ সুদীপ্তর ও হাতটা যেন একটু কেঁপে গেলো

আবার সেই গলা— "চলে যা... চলে যা... তোরা চলে যা..."

মনে হচ্ছিল, কেউ যেন একেবারে আমাদের কানের কাছে এসে হাড়হিম করা মিহি গলায় কথাগুলো বলছে।

ভয়ে আমরা কেউই নড়তে পারছিলাম না। নিজেদের অজান্তেই গাড়িটাও কখন যে থেমে গেছে, আমরা বুঝতেই পারিনি।

হঠাৎ আমরা এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, যা আজও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে।

সাদা শাড়ি পরা এক ছায়া মূর্তি রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চারপাশে এত ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম!

আমরা কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সুমন সেই ছায়া মূর্তির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল। সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি তার মাথা নিচু করে দিলো।

—"ওদিকে তাকাস না!" আমি বললাম।

সুদীপ্তও বলল, —"চোখ বন্ধ কর!"

আমরা সবাই চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কিছুক্ষণ পর সুদীপ্ত আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,

—"তুমি কে? কে তুমি?"

কোনো উত্তর এল না।

আরও কিছুক্ষণ পর আমরা চোখ খুললাম। সুদীপ্ত সামনে তাকিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই।

—"কেউ নেই!" সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল।

আমরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকালাম। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ঠিক করলাম, এবার বাড়ির দিকেই ফিরে যাব।

গাড়ি চালাতে চালাতে কখন যে আমরা ওই পথটা পেরিয়ে এসেছিলাম, তা বুঝতেই পারিনি। কিছুটা পথ এগোতেই জঙ্গলটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এলো। চাঁদের আলোয় চারদিক আবার পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে একটা লোকালয়ের কাছাকাছি গাড়িটা দাঁড় করালাম।

দূরে গ্রামের বাড়িগুলো চোখে পড়তেই যেন আমরা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। ঝটপট উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখি, চারদিকে সবুজ মাঠ, গাছপালা আর সকালের নির্মল আলো। কিছুক্ষণ যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না গত রাতে সত্যিই আমাদের সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল!

এরপর আমরা তারাপীঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। সকাল আটটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম তারাপীঠে।

তারাপীঠে পৌঁছেই প্রথমে গেলাম মহাশ্মশানে। কিন্তু দিনের আলোয় তারাপীঠের মহাশ্মশানকে যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল। চারপাশে ইট-পাথরের তৈরি ঘরবাড়ি, মানুষের আনাগোনা – গত রাতের সেই অন্ধকার শ্মশানের স্মৃতির সঙ্গে সকালের এই দৃশ্যের যেন কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু এক জায়গায় জমে থাকা বিশাল মরা পোড়ানো ছাইয়ের স্তূপটা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, এটাই সেই মহাশ্মশান।

যদিও চারপাশে বসে ছিল বেশ কয়েকজন তান্ত্রিক ও সাধু। আমি একবার সুমন আর সুদীপ্তর মুখের দিকে তাকালাম। ওদের চোখেমুখেও যেন একই প্রশ্ন। ঠিক তখনই সুদীপ্তর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। সুদীপ্ত মৃদুস্বরে বলল,

– চল, মন্দিরের দিকে যাই।

মহাশ্মশান থেকে মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট বটগাছের তলায় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

আমরা তিনজন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন,

—যা, পুজো দে। কাল রাত্তিরে তোদের যা হয়েছে, তার পর তোদের মায়ের আশীর্বাদ দরকার।

আমরা তিনজনই একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে তান্ত্রিককে জিজ্ঞেস করল,

—কী বলছেন আপনি?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন,

—যা বলছি, তোরা জানিস। অমান্য করিস না। পুজোর দরকার আছে তোদের। মায়ের কাছে ভালো করে পুজো দে।

এই কথা বলেই তিনি আবার চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে গেলেন।

আমরা দু-এক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আর কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে তারাপীঠের মন্দিরের দিকে যাওয়া লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

== সমাপ্ত ==



আগেই বলে রাখি, আমি ভীতু নই। মানে... প্রায় নই। শুধু রাতের অন্ধকারে বাগানে যেতে হলে কাউকে সঙ্গে নিই, । এটাকে ভীতু বলে না, বলে "সাবধানতা"!

আমি ময়ূখ, ক্লাস ফাইভে পড়ি। আজ শনিবার ১০ই অক্টোবর, মহালয়ার দিন , যা ঘটল, শুনলে তোমাদের হাত থেকে চকোলেট পড়ে যাবে! আগে একটা দুঃখের কথা বলে নিই। গত মাসে আমার বড় দাদু, মানে বাবার দাদু, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর কথা মনে পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যায় , যেন কেউ বুকের ওপর একটা বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে। বড়দাদু বলতেন, "দাদুভাই, দুঃখ পেলে একটু হেসে নিস, দেখবে দুঃখ তখন লজ্জা পেয়ে পালাবে।" তাই গল্পটা আমি হাসতে হাসতেই বলব।

সকালে রেডিও তে মহালয়া শোনার পর মা ঘোষণা করলেন, "আজ চিলেকোঠা গোছাবি।" আমি বললাম, "মা, আজ তো মহালয়ার ছুটির দিন !" মা বললেন, "সেজন্যই তো!" পুরানো ঘর দোর গুছাতে হবে।

দেখো কাণ্ড! মহালয়ার দিন নাকি ছুটির দিন নয়, বাড়তি কাজের দিন!

একটু বেলাতে বড়মার কাছে শুয়ে গল্প করছিলাম। মা মিলিটারি মেজাজে এসে বলল " শুয়ে থাকলে চিলেকোঠা গোছানো কখন হবে? বড়মা মানে বাবার দিদিমা, পাশ থেকে ফিসফিস করে বললেন, "চিলেকোঠা ঘরে রাতে নাকি খটখট শব্দ হয়, জানিস?" আমি বললাম, "বড় মা এখন সকাল!" ঠাকুমা বললেন, "আজ জানো তো পূর্ব পুরুষরা সব তাদের উত্তরাধিকারদের সাথে দেখা করতে আসেন?" ব্যস, আমার পেটের ভেতর প্রজাপতি নয়, পুরো চিড়িয়াখানা নাচতে শুরু করল! সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ কাঁচ... কাঁচ... করে বলছে, "যেও না... যেও না..." আমি বললাম, "আমারও যেতে ইচ্ছে নেই ভাই, কিন্তু মায়ের হুকুম ভূতের ভয়ের চেয়েও বড়!"

দরজা ঠেলতেই ক্যাঁ-আ-আ-চ! ভেতরে আলো-আঁধারির খেলা। জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ঢুকেছে, তাতে ধুলোরা নাচছে, যেন ছোট ছোট ভূতের পার্টি! মাকড়সার জাল ঝুলছে, যেন মাকড়সা গুলো বড়দাদু ঘর পাহারা দিচ্ছে। একটা আরশোলা কটমট করে তাকাল। আমি বললাম, "আমি ভাড়াটে নই, মায়ের হুকুমে এসেছি।" সে মাথা নেড়ে সরে গেল।

হঠাৎ... খুট্! আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলায় আটকে গেল। পেছনে তাকালাম, কেউ নেই। কোথা থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে আমার ঘাড় ছুঁয়ে গেল। ধড়াম! দরজাটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "ভূ... ভূ..." তারপর দেখি, দরজার পেছনে একটা শুঁয়োপোকা ভঙ্গিতে ঝুলছে আমার নিজেরই ছায়া। ছায়া দেখে ভয় পেয়েছি! নিজের ছায়াকেই ভূত ভাবলাম, এ লজ্জা রাখি কোথায়!

তারপর হঠাৎ চোখ গেল ঘরের কোণে। একটা বিশাল পুরনো নকশাকাটা কাঠের বাক্স! , গায়ে ধুলোর পাহাড় আর সময়ের ছাপ, যেন কত বছর কেউ ছোঁয়নি। অথচ আশ্চর্য, বাক্সের ঢাকনার ধুলো কেমন যেন আঙুলের দাগে ভরা, যেন কেউ বারবার ওটা খুলেছে! ওতে কি গুপ্তধন আছে!! সোনার মোহর পাব!! নাকি ভূত।

আমার পা বলল, "পালাই!" আমার মন বলল, "দেখি তো!" শেষে মনেরই জিত হলো, কারণ পা তখন এত কাঁপছিল যে দৌড়নোর ক্ষমতাই ছিল না।

তারপর জয় মা বলে হুড়মুড়িয়ে নেমে বাবাকে ডেকে আনলাম। বাবা গঙ্গার ঘাট থেকে তখন তর্পণ করে ফিরেছে । আমার সাথে বাবা চিলেকোঠায় এসে বাক্সটা দেখে চুপ করে গেলেন। দেখলাম বাবার চোখের কোণ কেমন ভিজে চকচক করে উঠল। আস্তে বললেন, "এটা তোর বড় দাদুর বাক্স।" আমি বললাম, "খুলি?" বাবা ঘাড় নাড়লেন। বাক্সে তালা নেই! এত পুরনো, এত রহস্যময় বাক্স, অথচ তালা নেই! বড় দাদু কি জানতেন, ঠিক সময়ে ঠিক মানুষটিই এসে ঢাকনা তুলবে?

আমার বুক ধুকপুক, ধুকপুক। কাঁপা হাতে ঢাকনা তুললাম... ক্যাঁ-আ-আ-আচ! আর তারপর...

ভূত নেই! মোহরও নেই! ভেতরে মোটা বাঁধানো একটা ডায়েরি, দাবার বোর্ড, একটা খুরপি, কয়েনের অ্যালবাম, বড় ফটো অ্যালবাম । আমার চোখ ছানাবড়া! গুপ্তধনের বাক্সে খুরপি! আমি ভাবলাম, বড় দাদু কি আমাকে মাটি খুঁড়ে মোহর খুঁজতে বলছেন? মনে মনে বললাম, "দাদু, এই বয়সে আমাকে দিয়ে চাষবাস করাবে?"

আর একটা খাম ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "প্রিয় ময়ূখ"। আমার নাম! একমাস আগে যিনি চলে গেছেন, খামটা খুললাম একটা চিঠি ! তাঁর চিঠি আমার নামে? গায়ে কাঁটা দিল, কিন্তু এবার ভয়ে নয়, অন্য কিছুতে। ফিসফিস করে পড়তে লাগলাম:

“প্রিয় ময়ূখ,

তুমি যখন এই চিঠি পড়ছ, তখন হয়তো আমি আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু মনে রেখো, দূরে চলে যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া এক কথা নয়।

এই ডায়েরিতে লিখে রেখেছি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা,আর দাবা খেলার কিছু কৌশল। সময় নিয়ে পড়বে। জানবে জীবনের দাবার বোর্ডে সব সময় রাজা-রানিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কখনও কখনও একটি ছোট্ট সৈনিকও খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দাবার বোর্ডটি তোমার জন্য। হারতে ভয় পেয়ো না। হার থেকে শিখতে পারলেই একদিন জিতবে।

ফটো অ্যালবামে আছে তোমার সঙ্গে আমার কাটানো দিনগুলো। কয়েনের অ্যালবামটিও তোমার জন্য। প্রতিটি কয়েনের পেছনে আছে একটি দেশ, একটি সময়, একটি গল্প। আমার মতো তোমার মধ্যেও দেশভ্রমণের নেশা জেগে উঠুক।

আর এই খুরপিটি, এটা দিয়ে গাছ লাগাবে। পৃথিবীকে সবুজ রাখার দায়িত্ব তোমারও। মনে রেখো, নিজের জন্য বাঁচা সহজ, অন্যের জন্য কিছু করে বেঁচে থাকাই আসল কথা।

আমি চাই না, তুমি শুধু আমাকে মনে করে কাঁদো। আমি চাই, তোমার ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে আমি বেঁচে থাকি।

ইতি,

তোমার বড় দাদু।”

পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। পাশে বাবা চোখে রুমাল দিয়ে নাক টেনে বললেন, "চোখে ধুলো ঢুকেছে।" আমি বললাম, "জানি বাবা, ধুলো।" বড়রা কাঁদলে দোষ সবসময় ধুলোর, এটাই নিয়ম!

ফটো অ্যালবাম খুললাম। ওমা, এই তো আমি! ন্যাড়া মাথায়, ফোকলা দাঁতে হাসছি, বড় দাদুর কোলে বসে! আরেকটায় বড় দাদু আমাকে দাবার ঘুঁটি চেনাচ্ছেন, আর আমি মন্ত্রীকে ধরে বলছি "রাজা"! মনে হলো, বড় দাদু যেন এখনই পাশের ঘর থেকে ডাকবেন, "দাদুভাই, এক হাত হবে নাকি?"

আরেকটায় বাগানে গাছ লাগাচ্ছি। একটা ছবিতে বড় দাদু আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে পড়ল, সেদিন তিনি বলেছিলেন, "গাছের যত্ন নিস। গাছ এর সাথে কথা বললে গাছ অনেক কিছু দিয়ে যায়।

আমি এবার ডায়েরিটা বুকে চেপে ধরলাম। আর তখনই বুঝলাম, গুপ্তধন সত্যিই ছিল! সোনা-রুপো কিংবা মোহর নয়, তার চেয়েও দামি। বড় দাদু কোথাও হারিয়ে যাননি। তিনি আছেন ডায়েরির প্রতিটি পাতায়, ছবির প্রতিটি হাসিতে, দাবার প্রতিটি চালে।
জানো, বড় দাদু কখনও হারতেন না। আজও হারলেন না! যাওয়ার আগে এমন এক চালে আমাকে মাত করে গেছেন, যার নাম ভালোবাসা।

পাশে বাবাকে বললাম, আমি ঠিক করেছি, রোজ একটু একটু করে ডায়েরি পড়ব, দাবা শিখব, কয়েন দেখে দেখে আমিও নতুন নতুন দেশ ঘুরব, আর খুরপি হাতে গাছ লাগাব। আর হ্যাঁ, ভয়টাও এবার একটু কমাব। কারণ বড় দাদুর মতো কেউ সাথে তো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই!

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বোল্‌ল "এটাই মহালয়ার দিনে সঠিক তর্পণ।
বড় দাদু, তুমি দেখো, আমি পারব। যেদিন একটা চারাগাছে জল দেব, জানি, তুমি ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসবে।তোমার শেখানো পথে হেঁটে, তোমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করে, তোমার ভালোবাসাকে কাজে পরিণত করে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব; সবসময়।

= = সমাপ্ত = =

-• শিকার ও শিকারী •-

তিয়াসা দত্ত

ধ্বংসাবশেষ জুড়তে পারিনি জানো, মৃত গোলাপ কুড়িয়েছি শুধু...
দু-এক পশলা বৃষ্টির ভিড়ে, হলুদ আঙুলের স্পর্শ চেয়েছে মন;
উষ্ণতার আঁচে, সেদিন জাহান্নাম ছিল কি জানা নেই!
তারপর এল শীত... চিরহরিৎ তখন পর্ণমোচী।
এ শরীরের স্টেশনে থেমে যায় ট্রেন, পাহাড় পেরিয়ে সমুদ্র খুঁজে-ফিরি আমি!
তবু, হৃদয়ের মলাটে আজও খয়েরি ভালোবাসা জীবন্ত,
প্রাচীন প্রার্থনা সাজিয়ে ঈশ্বর প্রণামে বসি, চুঁয়ে পড়া সুখে পবিত্রতা মেশে;
আমি অ্যাপোক্যালিপ্স ভুলে গিয়ে ভালোবাসা শিখি... ভালো বাসতে শিখি।

শহরের ভাতঘুমে নিরাপত্তা থাকে না আজ-কাল
মৃত্যুর গন্ধ ভেসে আসে অলি-গলি-রাজপথ পেরিয়ে
নিরুদ্দেশের শব্দ হয় না কোনো, মুছে যাওয়ার মতো নিরুত্তর!
তবুও ভেসে আসা জ্যোৎস্নার চাদর সরিয়ে ফিরে আসে টান,
কবরের উপর গোলাপ রাখা রাতে, ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়া যায় না...

ছাতিম ফুলের গন্ধে কবেই যৌবন ফুরিয়েছে,
আঙুলে জলের দাগ, শিকড়ের খুব কাছে পৌঁছে দেয়
এড়িয়ে যাওয়ার মতো দুপুর শুষে নিতে চায় অস্তিত্ব! মাস্তুলহীন জাহাজ রেখে দেয় নোনা স্বাদ,
ছুঁয়ে দেয় মেঘলা হাওয়া, তবু রাজকন্যা পায় না জলের খোঁজ...

শিরা ওঠা হাতের গায়ে মিশে যায় বার্ধক্য,
এক ছুটে পেরোনো নদী ভুলে যায় ডাকনাম, চেনা ওম
শুধু কিছু মাছরাঙা পড়ে আছে বৃষ্টির অপেক্ষায়,
ক্রমে জীবনে ফুরিয়ে আসে গ্রীষ্ম, ঘিরে ধরে শীতল হাতছানি
তাছাড়া, ধর্মের ব্যাখ্যা আমার কাছে সাকার ছিল না কোনোদিনই...
রেখে যাব বলতে ওটুকুই, আমার ভাঙাচোরা ঈশ্বর!



সময়টা ছিল সকাল এগারোটা। আমরা তিন বন্ধু রাজদীপ, সুমন আর আমি, সুদীপ্ত— কালীপুজো উপলক্ষে আমার দাদুর বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। অনেক দিন পর দাদুর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাই রাজদীপ ও সুমনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে রওনা দিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল কালনার কুলধারা। সকাল থেকে গাড়ি চালিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সেখানে পৌঁছোতে বিকেল প্রায় চারটে বেজে গেল। রাস্তার দুপাশে কখনও ছোট ছোট গ্রাম, কখনও বিস্তীর্ণ মাঠ, আবার কখনও ঘন গাছপালা চোখে পড়ছিল। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমরা পথের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি অবশ্য ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করছিল।

গাড়ি যখন গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছোল, তখন রাজদীপ অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "আর কত দূর, সুদীপ্ত? আর কতক্ষণ যেতে হবে? সেই সকাল থেকে গাড়িতে বসে আছি!"

আমি হেসে উত্তর দিলাম, "আর একটু ধৈর্য ধর। এই তো, প্রায় পৌঁছেই গেছি। আর বেশি দেরি হবে না।"

সুমনও ক্লান্ত গলায় বলে উঠল, "দাদুর বাড়ি যেন একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে!"

ওর কথা শুনে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির মধ্যেও আমাদের হাসি-ঠাট্টা চলছিল।

সকাল এগারোটা থেকে একটানা যাত্রা করতে করতে আমাদের সবারই খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কিছুটা এগোতেই রাস্তার ধারে একটা ধাবা চোখে পড়ল। ধাবাটার সামনে কয়েকটি গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। আমরা আর দেরি না করে গাড়িটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ধাবার ভেতরে কয়েকটি টেবিল-চেয়ার পাতা ছিল। এক কোণে দু-একজন পথযাত্রী বসে খাওয়াদাওয়া করছিলেন। আমরা একটা খালি টেবিলের পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর একজন কর্মচারীকে ডেকে বললাম, "দাদা, তিন কাপ চা দেবেন। আর সঙ্গে কিছু খাওয়ার থাকলে সেটাও দিন। সকাল থেকে রাস্তায় আছি, ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা ও খাবার এসে গেল। আমরা তৃপ্তি করে খাওয়াদাওয়া করলাম। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে শরীরটাও যেন একটু চাঙা হয়ে উঠল। এতক্ষণে আমাদের ক্লান্তি অনেকটাই কমেছে বলে মনে হলো।

ধাবা থেকে বেরিয়ে আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। খাওয়াদাওয়া করে শরীরটা কিছুটা চাঙা লাগছিল। আমি স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে গাড়ি চালাতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুটা পথ এগোতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, গাড়ির তেলের কাঁটা প্রায় শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রাজদীপও ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “কী রে সুদীপ্ত, তেল তো প্রায় শেষ! আশপাশে কোনও পেট্রোল পাম্প আছে তো?”

আমি বললাম, “জানি না রে। এই রাস্তাটা আমার খুব একটা চেনা নয়। তবে সামনে নিশ্চয়ই কিছু একটা পাওয়া যাবে।”

কথাটা বললেও মনে মনে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কারণ, ততক্ষণে আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে এমন একটা অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি, যেখানে দুপাশে ঘন জঙ্গল আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ছিল। রাস্তার একদিকে সারি সারি শালগাছ, অন্যদিকে পিয়াল আর মহুয়ার গাছ। কোথাও কোথাও গাছের ফাঁক দিয়ে লাল মাটির সরু পথ চলে গিয়েছে অচেনা কোনও গ্রামের দিকে। দূরে মাটির বাড়ি, খড়ের চাল আর উঠোনে শুকোতে দেওয়া শস্য চোখে পড়ছিল। মাঝে মাঝে দু-একজন গ্রামবাসীকে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু রাস্তায় যানবাহন প্রায় ছিলই না।

জায়গাটা যেন শহরের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দূরে কোথাও পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকানও চোখে পড়ছিল না।
কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তার এক পাশে একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পেলাম। দোকান বলতে বাঁশ আর কাঠের খুঁটির ওপর দাঁড় করানো টিনের চালের একটা ঘর। সামনে কয়েকটা বিস্কুটের কৌটো, কয়েকটি কাচের বোতল আর দু-একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সাজানো ছিল। দোকানের সামনে একটি বয়স্ক লোক বসে ছিলেন।

আমি গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে নেমে তাঁর কাছে গেলাম।
“কাকু, একটু জিজ্ঞাসা করব,” আমি বললাম। “এখান থেকে কাছাকাছি কোনও পেট্রোল পাম্প আছে?”

বয়স্ক লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীর গলায় বললেন, “পেট্রোল পাম্প? এদিকে তো কাছাকাছি কিছু নেই বাবা। তোমরা আরও খানিকটা এগিয়ে যাও। সামনে একটা বড় মোড় পাবে। সেখান থেকে বাঁ দিকে গেলে একটা পাম্প আছে। তবে এখান থেকে বেশ কিছুটা পথ।”

কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা একটু ধক করে উঠল। গাড়িতে যে পরিমাণ তেল ছিল, তাতে এতটা পথ যাওয়া যাবে কি না, বুঝতে পারছিলাম না।
সুমন গাড়ি থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, “কাকু, পাম্পটা কি অনেক দূরে?”

লোকটি এবার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তা খুব কাছে নয় বাবা। তবে সাবধানে চালিয়ো। এই রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় লোকজনের দেখা পাওয়া মুশকিল। পথ ভুল করলে মুশকিল এ পরে যাবে ।”

তাঁর কথা শুনে রাজদীপ আমার দিকে তাকাল। আমি অবশ্য আর কথা না বাড়িয়ে লোকটিকে ধন্যবাদ জানালাম।

তারপর গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলাম। গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। গাছের লম্বা ছায়া রাস্তার ওপর পড়েছে। দূরের গ্রামগুলোর বাড়িঘরও যেন গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।
আমরা তিনজনেই এবার একটু চুপচাপ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আগে যে হাসি-ঠাট্টা চলছিল, তা আর হচ্ছিল না। সবার মনেই একটাই চিন্তা-- পেট্রোল পাম্পে পৌঁছোনোর আগে যদি তেল ফুরিয়ে যায়!

অবশেষে বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর দূরে একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। তার পাশে পেট্রোল পাম্পের আলো জ্বলছিল। যেন অন্ধকার নামার আগে আমরা একটু স্বস্তির ঠিকানা খুঁজে পেলাম। পাম্পে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তেল ভরলাম। তারপর আবার দাদুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

*****

দাদুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি, কালীপুজোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তখন আমাদের ফোনে রাত সাড়ে দশটা বাজে। বাড়িতে ঢুকেই দিদা ও দাদুকে প্রণাম করলাম। চারদিকে পুজোর ব্যস্ততা। ধূপের গন্ধ, প্রদীপের আলো আর বাড়ির লোকজনের কথাবার্তায় গোটা বাড়িটা যেন উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে।

আমি রাজদীপ ও সুমনকে বললাম, "তোরা চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম নে। আমি দাদুর সঙ্গে পুজোর প্রস্তুতিতে একটু হাত লাগিয়ে আসছি।"

একটু পরেই পুরোহিতমশাই এসে উপস্থিত হলেন। শুরু হয়ে গেল কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হলো।

আমরা তিন বন্ধু চেয়ারে বসে পুজো দেখতে লাগলাম। রাত যত বাড়ছিল, চারপাশের পরিবেশও তত শান্ত হয়ে আসছিল। প্রদীপের আলো, ধূপের ধোঁয়া আর পুরোহিতমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ মিলিয়ে গোটা বাড়িতে এক অদ্ভুত গম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বাড়ির উঠোনের বাইরে তাকালে দূরের গাছপালাগুলোকে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল।

পুজোর কিছুটা এগোনোর পর দাদু এসে আমাদের পাশে বসলেন। রাজদীপ তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদু, তোমার কি ভূতের গল্প জানা আছে?"

দাদু মৃদু হেসে আমার দিকে তাকালেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের গল্প বলছে কেন রে নাতি? ভূতের গল্প নয়, তোদের একটা সত্যি ঘটনা বলব। নিজের চোখে যা দেখেছি, তা কি আর গল্প করে বানিয়ে বলতে হয়?"

দাদুর কথার ধরন শুনে আমরা তিনজনেই একটু নড়েচড়ে বসলাম। রাজদীপও এবার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বসল। আমি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যি ঘটনা? কী দেখেছিলে দাদু?"

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর চারপাশে একবার তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, "সে অনেক দিনের কথা রে। এমন এক ঘটনা, যা আজও ভুলতে পারিনি। তারপর বলতে শুরু করলেন তাঁর জীবনের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা।

*****

"ঘটনাটা অনেক বছর আগের রে। তখন আমি এত বুড়ো হইনি! একবার একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। "যে রাস্তা দিয়ে ফিরবো, সেটা ছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া একটা নির্জন পথ। তাই আর দেরি না করে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দিলাম।

চারদিকে তখন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। রাস্তার দুপাশে ঘন শাল-পিয়াল গাছ, ঝোপঝাড় আর লতাপাতায় ভরা। কোথাও কোথাও গাছের ডালপালা এমনভাবে রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল যে আকাশের চাঁদটাকেও ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। রাতের অন্ধকারে চারপাশটা কেমন যেন অচেনা লাগছিল।

"মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে উঠছিল। আর সেই নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের পায়ের শব্দও কেমন অস্বাভাবিক জোরে কানে আসছিল। মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের মধ্যে কেউ যেন আমার পিছু পিছু আসছে।

“হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা কালো বিড়াল দেখতে পেলাম। বিড়ালটা চুপচাপ বসে ছিল। আমি কাছে যেতেই ও মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। কেমন অদ্ভুত সেই দৃষ্টি!
“আমি ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় বিড়ালটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর রাস্তার পাশের একটা ঘন ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা যাওয়ার পরেই ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়ল।

“আমি মনে মনে ভাবলাম, যাক, বিড়ালটা নিজের পথে চলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা দেখার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না!
“যে ঝোপের মধ্যে বিড়ালটা ঢুকেছিল, সেখান থেকেই একটা মেয়ে বেরিয়ে এল।

“মেয়েটার বয়স হবে উনিশ কিংবা কুড়ি বছর। গায়ের রং ঘন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তার রূপ ছিল অসাধারণ। মৃদু চাঁদের আলোয় তার মুখটা যেন আরও মায়াবী হয়ে উঠেছিল। টানা টানা চোখ, নিখুঁত মুখের গড়ন আর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা মৃদু হাসি— সব মিলিয়ে তাকে একবার দেখলে চোখ ফেরানো কঠিন। অথচ তার সেই সৌন্দর্যের মধ্যেই কেমন যেন একটা অচেনা রহস্য লুকিয়ে ছিল।

“তার ঘন কালো চুল পিঠ বেয়ে কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছিল। চুলগুলো সুন্দর করে লম্বা বেণি করে বাঁধা। বেণির দুই প্রান্তে ছোট্ট সাদা ফুল বাঁধা ছিল। চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে সেই সাদা ফুল দুটো স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। জঙ্গলের নির্জন পথে এমন সাজে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

“আমি চারপাশে তাকালাম। আশপাশে কোনও বাড়িঘর নেই, কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। তা হলে এই মেয়েটা এল কোথা থেকে? আর একটু আগেই তো ওই ঝোপের মধ্যে একটা কালো বিড়াল ঢুকতে দেখলাম! “আমি ভালো করে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

“তখনই আমার মনে হলো, এ কোনও সাধারণ মেয়ে নয়। একটু আগের সেই কালো বিড়ালটার সঙ্গে এর নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে।

“আমাদের সাঁওতালদের মধ্যে কত রকমের পুরোনো বিশ্বাস আর লোককথা প্রচলিত আছে, জানিস তো? ছোটবেলা থেকে বড়দের মুখে কত অদ্ভুত কাহিনি শুনেছি। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল এমনই এক ভয়ংকর সত্তার কথা।
“আমি বুঝতে পারলাম, ওটা সাধারণ কোনও মেয়ে নয়, -ওটা ডান!”

*****

“ডান আমাকে ভুলিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই সে হঠাৎ ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের মিষ্টি হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল। তার চেহারায় এমন এক ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিল যে সাধারণ কোনও মানুষ হলে হয়তো ভয়ে সেখানেই জ্ঞান হারাত।
“সে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হিসহিসে গলায় বলে উঠল, ‘তোকে একা পেয়েছি! তোকে আমি ছাড়ব না!’

আমার মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের মধ্যে গাছপালার আড়ালে আরও কেউ যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, এই সময় ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেই ডান আমার ওপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাবে।

“আমি বুক চিতিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘বুকে পাটা থাকলে আমার কোনও ক্ষতি করে দেখা!’

“আমার কথা শুনে ডান আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি আর দেরি করলাম না। ছোটবেলা থেকে শেখা কিছু মন্ত্র আমার জানা ছিল। আমি মনে মনে সেই মন্ত্র স্মরণ করে দেহবন্ধনের মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম।

“মন্ত্র পড়তে পড়তে নিজের চারপাশে এক অদৃশ্য সুরক্ষাবলয় তৈরি করলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, এই দেহবন্ধন আমাকে ডানের অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডান বারবার আমার কাছে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু যেন কোনও অদৃশ্য বাধায় আটকে যাচ্ছিল।

“তার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। সে রাগে গর্জন করতে লাগল। কিন্তু আমার কাছে পৌঁছোতে পারল না।

“তারপর কী হয়েছিল, জানিস?”
এতটা বলে দাদু একটু থামলেন।

আমরা তিন বন্ধু নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উঠোনের একপাশে তখনও কালীপুজোর প্রদীপ জ্বলছিল। দূরে রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল।
রাজদীপ, যে একটু আগেই ভূত বলে কিছু হয় না বলে হাসছিল, সেও এবার গম্ভীর হয়ে বসে পড়েছে। সুমন কোনও কথা বলছিল না। আর আমি অধীর আগ্রহে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
শেষ পর্যন্ত রাজদীপই নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল, “তারপর কী হলো, দাদু?

দাদু বলতে শুরু করলেন—
“আমার মন্ত্রের শক্তি বুঝতে পেরে ডানটা ভয় পেয়ে গেল। সে আর আমার কাছাকাছি আসতে পারছিল না। দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর গলায় চিৎকার করে বলল, ‘পালাও! এখান থেকে পালাও! নইলে তোকে মেরে ফেলব! তুই আমার ক্ষমতা জানিস না!’
“কিন্তু আমি একটুও ভয় পেলাম না। ডানটা কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে যেতে জঙ্গলের গভীরে চলে যেতে লাগল।

“আমি ভাবলাম, ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই আমিও ওর পিছু পিছু এগোতে লাগলাম। কিছুটা যাওয়ার পর দেখলাম, ডানটা একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। গাছটার চারপাশে ঘন অন্ধকার। তার ঝুরি আর ডালপালাগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে চাঁদের আলোও ঠিকমতো মাটিতে এসে পৌঁছোচ্ছিল না।
“আমি যখন সেখানে পৌঁছোলাম, তখন আর ডানটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এক মুহূর্ত আগেও যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যেন চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

ওই রাতে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না তাই সেই সময়ের মতো বাড়ি ফিরে এলাম।

*****

“পরদিন সকালে আমি তোর মামাকে সঙ্গে নিয়ে আগের রাতে যে রাস্তার পাশে ডানটাকে দেখেছিলাম, সেই গ্রামের দিকে গেলাম। আগের রাতে ডানটার মুখ ভালো করে দেখেছিলাম। তাই ওকে আবার দেখলে চিনতে পারব, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

“গ্রামে পৌঁছে আমি সেখানকার মোড়লমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে আগের রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তারপর আমরা দুজনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এভাবে আর কত দিন চলবে? এই ডানটাকে আটকানোর কোনও ব্যবস্থা কি করা যায় না?’
“কিন্তু তখনও আমরা জানতাম না, সামনে আরও ভয়ংকর বিপদ অপেক্ষা করছে।
“প্রায় এক সপ্তাহ পরে সেই গ্রামে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। ডানটা একটি ছোট্ট শিশুকে মেরে ফেলল। এই ঘটনায় গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত। তখন মোড়লমশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন।

“আমি বুঝতে পারলাম, এই ডানটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে গ্রামের লোকজনের আমার সাহায্যের প্রয়োজন। তাই মোড়লমশাইয়ের কাছে গিয়ে বললাম, ‘আমি প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই ডানটাকে নিজের চোখে দেখেছি। দেখতে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ের মতো। আমি যদি ভালো করে খোঁজ করতে পারি, তা হলে হয়তো ওকে আবার দেখলে চিনে ফেলতে পারব।’

“তারপর আমি মোড়লমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমি এই গ্রামের সবাইকে চিনি না। তবে এই বয়সের মেয়েদের মধ্যে কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?’
“মোড়লমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ‘আপনি ডানটাকে যেমন দেখেছিলেন, তার চেহারার বর্ণনা একটু বিস্তারিতভাবে দিন। আমাকে এক ঘন্টা সময় দিন। এর মধ্যে গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখি।’

“আমি তাঁকে ডানটার বয়স, চেহারা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্তারিতভাবে বললাম। তারপর আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।
“প্রায় এক ঘন্টা পরে খবর এল, গ্রামের চারটি মেয়ের বয়স আমার দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

“আমি মোড়লমশাইকে বললাম, ‘ওদের কাউকে কিছু জানাবেন না। আমরা দুজনে দূর থেকে গিয়ে মেয়েগুলোকে দেখে আসি। যদি তাদের মধ্যে সেই ডান থাকে, তা হলে আমি নিশ্চয়ই চিনতে পারব।’

“সেইমতো আমরা দুজনে গোপনে মেয়েগুলোর বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। “প্রথম বাড়িতে গিয়ে আমার সন্দেহ হলো না। দ্বিতীয় বাড়িতেও তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তৃতীয় বাড়িতে পৌঁছোতেই আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।”
“আমি মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। এ সেই মেয়ে! সেই নির্জন জঙ্গলে যাকে আমি কালো বিড়াল থেকে মেয়ের রূপ ধারণ করতে দেখেছিলাম।

“তবু আমি মুখে কিছু বললাম না। মোড়লমশাইও মেয়েটির সামনে কোনও কথা বললেন না। আমরা এমনভাবে সেখান থেকে ফিরে এলাম, যেন কিছুই ঘটেনি।
“কিন্তু মনে মনে আমি বুঝতে পারছিলাম, ডানটাকে খুঁজে পেয়েছি ঠিকই, তবে তাকে ধরতে হলে আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। কারণ, সে যদি একবার বুঝতে পারে যে আমরা তার আসল পরিচয় জেনে গেছি, তা হলে সে আরও ভয়ংকর কিছু করে বসতে পারে। “বাড়ি ফিরে মোড়লমশাই মেয়েটির বাবাকে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিকের কথা বলার পর তিনি মেয়েটির খবর জানতে চাইলেন।
“মেয়েটির বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কী আর বলব মোড়লমশাই! বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়েটা খুব অসুস্থ। কিন্তু ওর অসুখটা ঠিক কী, তা বুঝতে পারছি না। দিনের বেলায় ও বাড়ির বাইরে বেরোতেই চায় না। সারাদিন ঘুমায়, কোনও কোনও দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ওর চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে থাকে। তখন আমরাই ওর মুখের দিকে তাকাতেই পারি না।’

“কথাগুলো শুনে আমি আর মোড়লমশাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনে পড়ে গেল সেই নির্জন জঙ্গলের কথা, মেয়েটির অস্বাভাবিক হাসি আর তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর কথা। তবু আমি মুখে কিছু বললাম

“মেয়েটির বাবা আবার বলতে শুরু করলেন, ‘আগে ও এমন ছিল না। হাসিখুশি থাকত, সবার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে কেমন যেন বদলে গেছে। এখন একা একা থাকতে ভালোবাসে। রাতে কখন ঘুমোয়, কখন জেগে থাকে, কিছুই বুঝতে পারি না। মেয়ের এই পরিবর্তন দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।’

“আমি মোড়লমশাইকে একান্তে বললাম, ‘মেয়েটির বাবাকে এখনই কিছু জানানো ঠিক হবে না। আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে, আসল রহস্যটা কী।’
“মোড়লমশাই আমার কথায় সম্মতি জানালেন। আমরা ঠিক করলাম, আপাতত মেয়েটির ওপর গোপনে নজর রাখব। তার আচরণ, রাতের গতিবিধি এবং অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ভালো করে লক্ষ করব।

*****

“এরপর আমি আর দেরি করলাম না। ফোন করে একজন তান্ত্রিককে ডেকে পাঠালাম। তাঁকে আগের রাতের ঘটনা এবং মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের সন্দেহের কথা সবিস্তারে জানালাম।
“সব কথা শোনার পর তান্ত্রিক বললেন, ‘ওই অশ্বত্থগাছের তলায় পুজোর আয়োজন করতে হবে। আমার বিশ্বাস, ডানটাকে সেখানে নিয়ে এসে বশে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে।’

“তাঁর কথা মতো মাঝরাতে সেই অশ্বত্থগাছের তলায় সমস্ত আয়োজন করা হলো। চারপাশে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে কোথাও শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছিল। গাছের বিশাল ডালপালা আর ঝুলে থাকা শিকড়গুলো অন্ধকারে আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো মাটিতে পড়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছিল।
“তান্ত্রিকের নির্দেশে আমি মাটির ওপর দুটি বড় গোল বৃত্ত আঁকলাম। তার মধ্যে একটিতে একটি পুতুল রাখা হলো, আর অন্য বৃত্তটি ফাঁকা রাখা হলো। কী উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হচ্ছে, তা তখনও আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার ছিল না।

“এরপর আমি মোড়লমশাইকে বললাম, ‘মেয়েটির বাবা-মাকেও সঙ্গে নিয়ে আসুন। তবে তাঁদের এমনভাবে নিয়ে আসবেন, যাতে মেয়েটি বা গ্রামের অন্য কেউ আমাদের পরিকল্পনার কথা জানতে না পারে।’
“তান্ত্রিক গাছের তলায় সাজানো সমস্ত আয়োজন ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে মন্ত্রপাঠ ও নানা আচার-অনুষ্ঠান চলল। আমরা সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলাম।

“হঠাৎ তান্ত্রিক গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ‘মেয়েটির বাবা-মাকে ডেকে আনুন!’
“মোড়লমশাই তাঁদের ডেকে আনলেন। তান্ত্রিক তাঁদের কাছে মেয়েটির একটি ছবি চাইলেন। ছবিটি হাতে পেয়ে তিনি সেটি একটি গোল বৃত্তের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর আবার মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন।
“এরপর শুরু হলো হোম। আগুনের শিখা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। তান্ত্রিকের মন্ত্রোচ্চারণে চারপাশের পরিবেশ যেন আরও ভারী হয়ে উঠল। আমরা কেউ কোনও কথা বলছিলাম না। প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

“কিছুক্ষণ পরেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। “হঠাৎ দেখলাম, মেয়েটি একটি ঝোপের পাশ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কোনও অদৃশ্য শক্তির টানে সেখানে চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফাঁকা গোল বৃত্তটির মধ্যে গিয়ে বসল। তার চোখেমুখে তখন এক অস্বাভাবিক ভাব। মনে হচ্ছিল, সে নিজের ইচ্ছায় সেখানে আসেনি।

“তান্ত্রিক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই কে? কেন এই মেয়েটির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিস? তুই যা করছিস, তা অন্যায়। এবার সত্যি কথা বল!’



“কিন্তু মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না। তার মুখের ভাব ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। কখনও সে অদ্ভুতভাবে হাসছিল, কখনও আবার তার চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলজ্বল করে উঠছিল। তার বাবা-মা ভয়ে একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
এরপর শুরু হলো যজ্ঞের শেষ পর্ব। তান্ত্রিক একের পর এক মন্ত্র পড়তে লাগলেন। আগুনের শিখা দপদপ করে জ্বলছিল। হঠাৎ মেয়েটি অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। “ঠিক সেই মুহূর্তে “তার শরীরের ভেতর থেকে একটা কালো বিড়ালের মতো ছায়া বেরিয়ে এল। ছায়াটা কিছুক্ষণ মাটির ওপর পাক খেতে লাগল। তারপর বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। “সেই দৃশ্য দেখে আমরা সবাই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। শুধু অশ্বত্থগাছের পাতাগুলো অদ্ভুতভাবে কাঁপছিল, যেন গাছটার চারপাশে এখনও কোনও অশুভ উপস্থিতি রয়ে গেছে।”

দাদু বললেন, “যজ্ঞের মন্ত্র আর হোমের আসল রহস্য তোরা বুঝবি না। তাই সেসব নিয়ে তোদের বিস্তারিত বলছি না। শুধু এটুকু জেনে রাখ, শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে ডানের হাত থেকে রক্ষা করে আমি ওর বাবা-মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।”

দাদুর কথা শুনে রাজদীপ অবাক হয়ে বলল, “দাদু, সত্যিই কি এমন হতে পারে? মানুষের শরীরের মধ্যে অন্য কোনও সত্তা বাস করতে পারে?” আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, “রাজদীপ, আমার দাদু কখনও মিথ্যে কথা বলেন না! উনি যা দেখেছেন, সেটাই আমাদের বলেছেন।”

দাদু মৃদু হেসে আর কিছু বললেন না। তারপর কালীপুজোর বাকি কাজকর্ম সামলাতে চলে গেলেন।

অবশেষে কালীপুজো শেষ হলো। চারদিকে তখনও প্রদীপের আলো জ্বলছিল। ধূপের গন্ধ আর পোড়া কাঠের হালকা গন্ধ বাতাসে মিশে ছিল। আমরা তিন বন্ধু উঠোনের একপাশে বসেছিলাম। পুজো শেষ হতেই সুমন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “কী রে, এতক্ষণ তো বেশ সাহস দেখাচ্ছিলি! এখন বল, এই রাতে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারবি?”

রাজদীপ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমার মনে হয়, আজ রাতে বাড়ি ফেরাটা একেবারেই ঠিক হবে না। এতটা পথ, তার ওপর নির্জন। রাস্তায় যদি আবার কোনও বিপদ হয়, তখন কী করব?"

আমি কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, "আমরা আজ রাতে আর ফিরব না। সকাল হলে, চারদিক ভালো করে আলো ফুটলে, তারপর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেব। রাতের অন্ধকারে অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না।"

আমার কথা শুনে সুমন আর রাজদীপ দুজনেই রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু সেদিনের রাতটা আর আগের মতো স্বাভাবিক রইল না। দাদুর বলা সেই ভয়ংকর কাহিনি বারবার আমাদের মনে পড়ছিল। উঠোনের বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকালেই মনে হচ্ছিল, গাছপালার আড়ালে যেন কেউ লুকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দূরে কোথাও একটা বিড়ালের ডাক শোনা গেল। আমরা তিনজনেই চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

রাজদীপ চাপা গলায় বলল, "তোরা শুনলি?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

= = সমাপ্ত = =



সবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগুন সবে থিতিয়েছে, ভাদ্দর মাসের শেষদিন । আকাশে তখনও হাঁড়ি পোড়ার মতো কালো মেঘের আনাগোনা। চন্দননগরের পশ্চিমে সরস্বতী নদীর পূর্ব পাড়ে ছোট্ট গ্রাম বিলকুলি । সেই গ্রামের চারদিকে ঘন বাঁশবন , আম লিচুর বাগান । নদীর ওপারে ধানক্ষেত সবুজ হয়ে আছে, তার মাঝে মাঝে বড় বড় মানকচুর পাতা দুলছে। কচু পাতার উপর শিশির পড়লে মুক্ত মনে হয়। আর সেই মুক্তোর মতো শিশির বিন্দুর দিকে তাকিয়ে অতীতে হারিয়ে যান একজন,রাণী ঠাক্‌মা..বাতাসে এখনও ভ্যাপসা গরম ভাব কাটেনি, কিন্তু তার মধ্যেই উঠোনে শিউলি ফুলের গন্ধের মায়া জড়ানো, মনে পরে যায় ছোটবেলার সাহাগঞ্জের বাপের বাড়ীর কথা। বিয়ের পর গ্রামের লোকজন বলতো সোনার বেনের মেয়ে সোনার সাথে সোনার মত মনও এনেছে ।

আজ রান্না পুজো।

তাই সন্ধে নামতেই রাণী ঠাক্‌মার উঠোনে নতুন মাটির উনুনে আঁচ পড়েছে। সারাবছর রান্না করা উনুনে রান্না হবে না, আজকের রান্না ওই নতুন মাটির উনুনেই হবে। এটাই নিয়ম।

এই বিল্কুলির দাস বাড়ীর বৃদ্ধার নাম - রাণীবালা। বয়স নব্বই হবে । গাঁয়ের সবাই ডাকে "রাণীমা বা রাণী ঠাক্‌মা। উঠোনে মাদুর পেতে বসে আছে সাথে তার বাড়ীর দুই নাতি-নাতনি - মতি, ভোলা এরা তার বড় ছেলে শিবচন্দ্র র ছেলে মেয়ে । পাশের গ্রাম বাকুবপুর থেকে এসেছে আরও দুই নাতি মদন আর বংশী। আর শহর থেকে এসেছে বড় নাতিবাবু অনাদি ।

অনাদি নাক সিঁটকে বলছে - "ঠাম্মা, আজ রান্না করে কাল বাসি ভাত খাবে তো? ইস! পেট খারাপ করবে তো!"

ঠাকুমা একমুখ হেসে কইল -"ওরে আমার সায়েব নাতি রে! বাসি কইলি? এ তো অমৃত! এ হলো মা মনসার প্রসাদ। শোন রে সব, তোদের একটা কথা কই।"

নাতি-নাতনি রা সবাই গল্প শোনার আশায় রাণী ঠাক্‌মার গা ঘেঁষে বসলো।

"আমাদের এই দিকে ভাদ্র মাসে মা মনসার বড় প্রকোপ থাকে রে। সাপ-খোপ, জ্বর-জ্বালা... তখন ওই মা'কে ঠান্ডা করতে হয়। তাই এই রান্না পুজো। এর আরেক নাম - অরন্ধন।"

অনাদি বলে উঠলো,"অরন্ধন মানে কি গো দিদা?"

"অরন্ধন মানে হইলো - রান্না বন্ধ। কাল সারাদিন উনুন জ্বলবে না। কোনো গরম ভাত না, কোনো ভাজা তরকারি মাছ না। আজ রাতে যা রাঁধাবো, কাল ঠান্ডা খাবো। মা'কে ঠান্ডা রাখলে, মা-ও আমাদের ঠান্ডা রাখবে। বুঝলি রে সব?"

বড় বউমা গিরিজা বাকি বউ-ঝি দের নিয়ে সব রান্নার কাজ সারছে, আর রাণী ঠাক্‌মা করছে তদারকি

উনুনের পাশে তখন বড় বড় হাঁড়ি চেপেছে। এক হাঁড়িতে গরম ভাত, আরেক হাঁড়িতে - ইলিশ এর ঝোল, পালং শাক, কচুর শাক ইলিশের মাথা দিয়ে , নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো, সাত রকমের ভাজা - আলুর, বেগুনের, পটলের, কুমড়োর, নারকোল, ঢ্যারস আর কাঁচকলা। কচুর লতি। চালতা দিয়ে টকের ডাল, মৌরোলা মাছের টক আর ঘন চালতার টক।

আর বড় কড়ায় ইলিশ মাছ ভাজা। গন্ধে গোটা পাড়া ম ম করছে। রাণী ঠাক্‌মা বললে - " ইলিশের তেল আলাদা তুলে রেখো বউমা, ভোলা , অনাদি খুব ভালবাসে। কচুর লতি আর মাছের মাথা দিয়ে ডাল একটুআলাদা রাখবে মদন আর বংশীর জন্য। আর মোতি মার জন্য মৌরোলা মাছের টক "

গিরিজা মাছ ভাজতে ভাজতেই বলল "জানি গো মা কে কি ভালোবাসে।"

নাতি নাতনি রা ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রাণী ঠাক্‌মা বলে চললেন,

"আগেকার দিনে, আমার দিদিশাশুড়ির থেকে শুনেছি সেই পুরানো আমল থেকেই ভাদ্র মাস মানেই তো গাঁ-গঞ্জ সব জলে ডুবে যেত। নদী-নালা উপচে পড়তো। মাঠ-ঘাট সব জলের তলায়। তখন জলাজঙ্গলের জীব, ওই বিষধর সাপের দল, কোথায় আর যাবে? শুকনো জায়গা খুঁজতে ঢুকে পড়তো আমাদেরই ভিটায় রান্না ঘরে - গোয়াল ঘরে বা ধান সেদ্ধর উনুনে।

ভিটা র মধ্যে শুকনো জায়গায় কুণ্ডলী পাকায়ে বসে থাকতো। তখন যদি না জেনেও উনুনে আগুন দিই, তাহলে ওই অবলা জীবটা পুড়ে মরবেকিংবা তার আগেই যদি রাগের চোটে ছোবল মারে, তাহলে গোটা ঘর উজাড় হয়ে যাবে। বাড়ন্ত ছেলেপিলে নিয়ে সংসার - তোদের মত ডানপিটে সব কালেই আছে।

তাই আমাদের মা-ঠাকুমারা, বাপ ঠাকুরদা দের সাথে বুদ্ধি করলো। বললো – 'না, ভাদ্র মাসের এই একটা দিন আমরা উনুন জ্বালব না। আগুনকেও ছুটি দিব। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে বাইরের সব কলকারখানার যন্ত্রপাতি যদি ছুটি পায় টা ঘরের যন্ত্রপাতি গুলি মানে রান্নার সব হাতা খুন্তি গুলো রে ছুটি পাবে না কেন বল দেখি"।' রান্না ঘর উনুন সবই পরিস্কার করার দারকার। এতে সাপ-খোপও বাঁচবে, মানুষও বাঁচবে। এইটাই তো জীবপ্রেম গো বুঝলে সবাই। এই সাপের ভয়েই বোল, আর জীবের ওপর মায়া থেকেই, আমাদের মায়েরা এই অরন্ধন এর নিয়ম তৈরী করলো। মা মনসাকে ঠান্ডা করার নাম করে, আসলে সব জীবকেই ঠান্ডা রাখার পুজো।" অরন্ধনতে মাটির সাথে পরিবেশও। কথাগুলো শুনে বংশী র গা-টা ছমছম করে উঠলো। সে অজান্তেই উনুনের ফাঁকের দিকে তাকালো। তাদের ভাবনায় ধান সেদ্ধর বড় উনুন লুকোচুরি খেলার লুকোনোর ভালো জায়গা হিসেবে ছিল।

মোতি শাড়ীর আঁচল ঠিক করে বললো, "ও ঠাম্মা, তাহলে পুজোটা কিভাবে করি আমরা অনাদিদাকে বলো। ও তো জানেই না, কি উপকরণ লাগে অরন্ধন এ..."

ঠাকুমা এবার ধীরেসুস্থে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মাটির বড় প্রদীপের সেই কাঁপা কাঁপা আলো-আঁধারিতে তার মুখটা আরও বেশি স্নিগ্ধ আর মায়াময় দেখাচ্ছিল।

রাণী ঠাক্‌মা কইল "অরন্ধন এর উপকরণ? শোন তবে। এই পুজোয় লাগে - মানকচুর পাতা, শালুক ফুল, শালুক ফুলএর ডাটি, আতপ চাল, সিঁদুর, কাঁচা হলুদ, গোটা সুপুরি, পান পাতা আর নতুন হাঁড়ি। আর লাগে মন। ভক্তি ভরে মন।

আর কইব

"আজ রাঁধি মা, কাল খাব,
তোমার নামে প্রদীপ জ্বালাব।
ঘরে দাও সুখ, মনে দাও শান্তি,
মনসা মা, রাখো কুলের কান্তি।"

আজ রাতে রান্না শেষ হইলে হাঁড়ির মুখে মানকচুর পাতা দিয়া ঢাকে দিব। ওর ওপরে শালুক ফুল আর সিঁদুরের ফোঁটা। তারপর উনুনটাকে গোবর জল দিয়া নিকাই দিয়ে কাল সকালে উঠানে আলপনা দেব।"

অনাদি অবাক হয়ে বলল,
“আলপনা? আলপনা কি দিতেই হয় দিদা?”

দিদা মৃদু হেসে বলল,
“ওরে অনাদি, আলপনা ছাড়া আবার পুজো হয় নাকি? কাল ভোর না হতেই গাঁয়ের সব বউ উঠোনে নেমে পড়বে। পিটুলি গুলে সাদা সাদা আলপনা দেবে উঠোনজুড়ে। উনুনের চারপাশে, তুলসীতলায়, ঠান্ডা হাঁড়ির সামনে, এমনকি দাওয়াতেও।”

দিদা একটু থেমে, যেন চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বলল, “আলপনায় আঁকা হবে সাপের ফণা, পদ্মফুল, ধানের শিষ, শঙ্খ আর মায়ের চোখ। জানিস, ওই আলপনা শুধু সাজানোর জন্য নয় রে। ও যে মায়ের আসার পথ। গাঁয়ের মা-বউরা বিশ্বাস করে, ওই সাদা পিটুলির রেখা ধরেই মা মনসা হাঁটতে হাঁটতে ঘরে আসেন। তাই আলপনার একটা দাগও যেন ভুল না হয়!”

অনাদি মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তারপর?”
দিদা বলল, “তারপর ওই আলপনার মাঝখানেই বসবে ঘট।
অনাদি আবার বলে উঠলো,"কিন্তু দিদা, বাসি ভাত খেলে তো গা গুলায় শুনেছি!"
ঠাকুমা এবার নাতির মাথায় আলতো করে স্নেহবশত একটা চাঁটি মারলো।
"ওরে হতভাগা! এ বাসি নয় রে! এ হলো পান্তা। শোন -

ভাদরে রান্না,
আশ্বিনে পান্তা ।
মা আমার মনসা বুড়ি,
রোয়া-র শেষে মঙ্গলকারী।
ঊনভোগে সাজিয়ে দিলাম মা'গো,
রেখো বছরভর আহ্লাদ - ভোগে।। "

শোনরে এই পচাভাদরে গরমে ভাত নষ্ট হয়ে যেত। তখন আমাদের মা-ঠাকুমা'রা বুদ্ধি করলো। ভাতে জল ঢ্যালে রাখলো। ওই জলটাই তো ঠান্ডা। ওই জল খেলে পেট- মন- গা সব ঠান্ডা থাকে।
ডাক্তারবাবুরাও তো এখন বলে -

'পান্তা ভাতের জল,
তিন পুরুষের বল’।

পান্তার জলকে গ্রামে আমরা বলি 'আমানি'।"
ভোলা বলল “অনাদিদা কাল আমাদের সাথে খেয়ে দেখো - অফফ দারুণ লাগবে টক র কাঁচা লঙ্কা দিয়ে।
মদন বলল

“পান্তা ভাত, কচু শাক,
চালতার টক ঝাল,
মনসা মায়ের কৃপায় যেন
ভালো থাকে সব কাল।”

তাই না দিদা । রাণী ঠাক্‌মা একটু থেমে, মুচকি হেসে মদনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আকাশের দিকে তাকালো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,
"তবে আসল কথাটা হলো - মিলমিশ। দ্যাখ, সারা বছর সবাই যার যার হাঁড়িতে রান্দে। কিন্তু এই রান্না পুজোর দিন, গাঁয়ের সব বউ-ঝি'রা একসাথে আমাদের গেটবাড়ীর উঠানে বসে কুটনো কোটে, গল্প করে।

একজনের উনুনের আঁচে আরেকজন হাঁড়ি চাপায়। এ হলো এক হওয়ার পুজো। কাল সকালে দ্যাখবি - আরও কত মামিমা- দিদিমা রা আসবে, পাল বাড়ী, ঘোষ বাড়ী,পাল বাড়ী, থেকে সবাই সবার বাড়ি থেকে পান্তা নিয়ে এসে একসাথে খাবে। কারো বাড়িতে মাছ, ভাজা, শাক কম পড়লে, আরেক বাড়ি এসে যাবে। এইটাই তো আমাদের গ্রাম। তারপরেই তো মা মনসা কে পূজো দিতে হবে রে।"

রাণী ঠাক্‌মা এবার গলাটা একটু নামিয়ে আনলো, "আর একটা কথা শোন। এই রান্না পুজোর রাতের হাঁড়ির ভাত কখনো ফুরায় না। মা মনসা নিজে হাতে ভাত বাড়ায়। আমার মা-শাশুড়ি বলতো - যে বাড়িতে রান্না পুজোর হাঁড়ি খালি থাকে, সে বাড়িতে অলক্ষ্মী ঢোকে। তাই তো আমরা বেশি করে রাঁধি। যাতে পাড়াপড়শি সব মানুষ , ভিখিরি এমন কি কুকুর-বিড়াল, পর্যন্ত - সবাই খেয়ে যায়। মা'র ভোগে কারো না নাই।"

অনাদি এবার চুপ করে গেছে। ফুটন্ত চাল্তার টক আর ভাজা ইলিশের গন্ধে তারও খিদে পাচ্ছে।সে জানে মা মনসা হোলো সর্পদেবী। বাড়ি মনসাতলাতে হলেও থাকা আর পড়াশোনা কলকাতায়। তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললো,
"দিদা, মা মনসা না হয় সাপের দেবী ? কিন্তু সাপকেও কেন পুজো করো?"

রাণী ঠাক্‌মা একগাল হাসি হাসলেন। তারপর নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,"ভয় পাস না বাবা। সাপকে আমরা মারি না, মান্য করি। ওই ধানক্ষেতে ইঁদুর খায় কে? সাপে। সাপ না থাকলে আমাদের ধান থাকবেনা। সাপ ত অন্ন রক্ষা করে। তাই সাপ হইলো আমাদের লক্ষ্মী। আর মা মনসা হলো তার মা। মাকে তুষ্ট রাখলে, মা আর ছোবল দিতে দেবে না। ছেলেপুলেরে আগলাই রাখবেক। তাই তো ভাতের হাঁড়িতে আমরা মানকচুর পাতা দিই, যাতে মা ঠান্ডা থাকে।"

রাত বাড়ছে। ঠাকুমা কথা মত বাড়ীর সকল মেয়ে বউরা সমস্ত রান্না শেষ করে হাঁড়িগুলোর মুখে মানকচু পাতা আর শালুক ফুল দিয়ে ঢেকে দিল। নতুন উনুনটা গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে দিল। চারপাশে পিটুলি দিয়ে গোল গোল আলপনা দিল বাড়ীর সব মেয়ে বউ রা। আলপনার মাঝে সাপের ফণা আঁকলো ঠাকুমা নিজের কাঁপা কাঁপা হাতে সাথে নাতনি মোতি কে বলল, “আমি যদি হাত কাঁপিয়ে ফেলি, তুই রেখাটা ধরে দিস। আমার মায়ের শেখানো আলপনাটা যেন আমার সঙ্গে হারিয়ে না যায় রে।”
- পরের প্রজন্ম কে শেখাতে হবে তো।

তারপর বলে উঠলো, "নে, এবার সব হাঁড়ির মাথায় সিঁদুর দে।
আর বল - 'মা মনসা ঠান্ডা থাকো, আমাদের ঠান্ডা রাখো।'
দুধ, কলা, আতপ চাল, কাঁচা হলুদ, সিঁদুর এই দিয়ে পুজো। কোনো পুরুত লাগে না রে। আমরাই পুজারী। আমরাই মা’র মেয়ে।"

সব নাতি-নাতনি হাত জোড় করলো। বাইরে ঝিঁঝি পোকা আর মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছয়ে। দূরে কোথাও ঢোল বাজছে - কাল মনসাতলায় পুজো হবে। বাতাসে তখন নতুন পান্তার, আলপনার পিটুলির আর ধূপের গন্ধ একসাথে মিশে এক অদ্ভুত মায়া তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে, এই উঠোনেই যেন মা মনসা এসে বসে আছেন, ঠান্ডা হাঁড়ির ওপর হাত রেখে।
ঠাকুমা মোতিকে জড়িয়ে ধরে বললো - "এই পুজো হইলো মাটির পুজো। গরমকে ঠান্ডা করার পুজো। আর মানুষে মানুষে যে রাগ-ঝগড়া, সবকিছুতে জল ঢেলে ঠান্ডা করার পুজো। কাল যখন ওই পান্তা ভাত মুখে দিবি, তখন বুঝবি - শরীর কেমন ঠান্ডা হয়ে জুড়াই যাচ্ছে। ওইটাই মা'র আশীর্বাদ। বুঝলি?"

পান্তা ভাত আর মাছ শাকের থালা,
উঠোন জুড়ে গন্ধ,
মনসা মায়ের নাম করলে মা
ঘুচায় সকল দ্বন্দ্ব।”

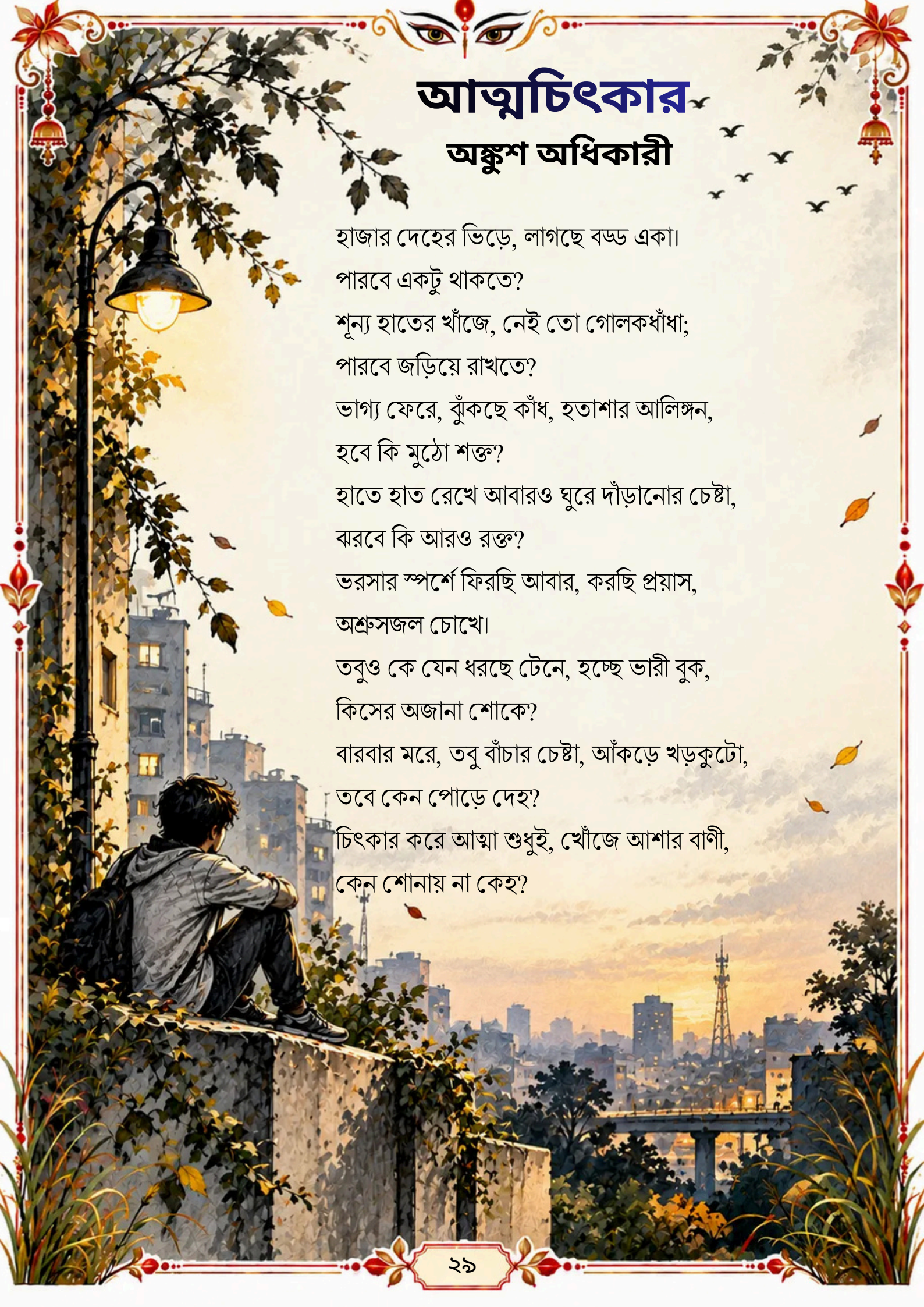
পান্তা ভাতের গামলায় তখন শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো পড়েছে। ঠান্ডা ভাত, ঠান্ডা মা, আর ঠান্ডা হয়ে আসা বিল্কুলির শেষ ভাদ্রর রাতে নাতি -নাতনিদের নিয়ে রাণী ঠাক্‌মা. আর বাড়ীর মা বউরা মিলে সরস্বতী নদীর পাড়ে অস্ত যাওয়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে মা মনসা কে প্রণাম জানালেন। নদীর পাড়ে মনসা থানে তখন একটা প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে - যেন মা নিজেই জেগে আছেন, তার সন্তানদের পাহারা দিতে।

ঘরে থাকুক লক্ষ্মী,
উঠোন থাকুক ভরা,
মনসা মায়ের কৃপায় যেন
সুখ না যায় সরা।
ছেলে-মেয়ে ভালো থাক,
বউ-ঝি থাক সুখে,
মনসা মায়ের আশীর্বাদে
হাসি ফুটুক মুখে।

= = সমাপ্ত = =

আত্মচিৎকার

অঙ্কুশ অধিকারী



হাজার দেহের ভিড়ে, লাগছে বড্ড একা।
পারবে একটু থাকতে?
শূন্য হাতের খাঁজে, নেই তো গোলকধাঁধা;
পারবে জড়িয়ে রাখতে?
ভাগ্য ফেরে, ঝুঁকছে কাঁধ, হতাশার আলিঙ্গন,
হবে কি মুঠো শক্ত?
হাতে হাত রেখে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা,
ঝরবে কি আরও রক্ত?
ভরসার স্পর্শে ফিরছি আবার, করছি প্রয়াস,
অশ্রুসজল চোখে।
তবুও কে যেন ধরছে টেনে, হচ্ছে ভারী বুক,
কিসের অজানা শোকে?
বারবার মরে, তবু বাঁচার চেষ্টা, আঁকড়ে খড়কুটো,
তবে কেন পোড়ে দেহ?
চিৎকার করে আত্মা শুধুই, খোঁজে আশার বাণী,
কেন শোনায় না কেহ?



রুদ্রনীল একজন আইটি ইঞ্জিনিয়ার। কাজের বেশিরভাগটাই তাকে রাতে করতে হয়। বলা যায়, নাইট শিফটেই তার বেশি পছন্দ। এত দিন যে বাড়িতে থাকত, সেখান থেকে অফিসে যাতায়াত করতে বেশ অনেকটা সময় লাগত। তাই শেষ পর্যন্ত অফিসের কাছাকাছি একটি নতুন ফ্ল্যাট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ফ্ল্যাটটি ছিল পাঁচতলা একটি বাড়ির চারতলায়, একেবারে কোণের দিকে। নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার পর প্রথম দিনটা তার সারাদিন ঘর গোছাতেই কেটে গেল। সন্ধ্যা নামতেই রুদ্রনীল অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

রুদ্রনীল সারারাত বাড়ির বাইরে থাকে। তাই দিনের বেশিরভাগ সময়ই তাকে একা কাটাতে হয়। অবশ্য একা থাকতেই তার ভালো লাগে। নিরিবিলি পরিবেশ, নিজের মতো করে থাকা-- এসবই তার পছন্দের। সোমবার সকালে স্নান সেরে রুদ্র ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চুল ঠিক করতে করতে হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল আয়নায়।

রুদ্র হাত তুলল।

এক সেকেন্ড পর আয়নার প্রতিবিম্বও হাত তুলল।

রুদ্র থমকে গেল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার হাত নাড়ল। এবারও তার মনে হলো, প্রতিবিম্বটি যেন সামান্য দেরিতে নড়ল।

— "হয়তো ঠিকমতো ঘুম হয়নি। চোখের ভুল।" নিজেকেই বোঝাল রুদ্র।

আর বেশি কিছু না ভেবে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে যথারীতি অফিসে চলে গেল।

এভাবেই কেটে গেল প্রায় এক সপ্তাহ।

কিন্তু এই এক সপ্তাহে রুদ্র বেশ কয়েকবার একই ঘটনা লক্ষ করল। সে নড়াচড়া করার কিছুক্ষণ পর তার প্রতিবিম্ব নড়ছে। কখনও এক সেকেন্ড, কখনও তারও কম সময়ের ব্যবধান। প্রথমে বিষয়টিকে চোখের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। পরে নিজেকেই বোঝাল, অতিরিক্ত কাজ আর ঘুমের অভাব থেকেই হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে।

কিন্তু একদিন সবকিছু বদলে গেল।
সেদিন ছিল মঙ্গলবার। কোনও এক কারণে সেদিন রুদ্রর অফিসে ছুটি ছিল।
নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার আনন্দে সে তার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু— শুভ, নিলয় আর প্রীতিকে রাতে খাওয়াদাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করল। এই তিনজনই ছিল রুদ্রর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এদের বাইরে আর কারও সঙ্গে তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না তার। রাতে তিন বন্ধু এসে পৌঁছাতেই ফ্ল্যাটটা জমে উঠল। খাওয়াদাওয়া, গল্প, হাসি সব মিলিয়ে বেশ ভালোই সময় কাটছিল তাদের।

গল্পের মাঝখানে নিলয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,
— "আচ্ছা রুদ্র, এত দিন তো তুই পুরোনো বাড়িতেই ছিলি। হঠাৎ নতুন ফ্ল্যাট নিলি কেন?"

রুদ্র হেসে বলল,
— "এই ফ্ল্যাটটা বেশ কম দামে পেয়ে গিয়েছিলাম। অফিসেরও খুব কাছে। তাই আর হাতছাড়া করিনি।"

গল্প করতে করতে কখন যে রাত অনেকটা গভীর হয়ে গিয়েছিল, কেউ খেয়ালই করেনি।
হঠাৎ রুদ্র উঠে দাঁড়াল।
— "তোরা বস। আমি বাথরুম থেকে আসছি।"

নিলয় বলল, —"আচ্ছা, যা। তবে বেশি দেরি করিস না।"

রুদ্র বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। আজকাল কেন যেন আয়নাটার দিকে বারবার তাকাতে ইচ্ছা করে তার। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল রুদ্র। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আজ প্রতিবিম্বটি তার মতো করে দাঁড়িয়ে নেই। রুদ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ আয়নার ভেতরের রুদ্র যেন তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক হাসি হাসছে। মুহূর্তের মধ্যে রুদ্রর সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল।
সে নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর আবার চোখ ফেরাল আয়নার দিকে।
প্রতিবিম্বটি নড়ছে না।
শুধু তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টি যেন রুদ্রর শরীর ভেদ করে তার মনের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে শুভর গলা শোনা গেল—
— "রুদ্র! কী হলো? এত সময় লাগছে কেন?"

শুভর গলা শুনে যেন হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল রুদ্র। আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল।

নিলয় হেসে বলল, — "কিরে! পেছনে কুকুর লেগেছিল নাকি? এমন দৌড়ে আসছিস কেন?"

সবাই হেসে উঠল। রুদ্রও জোর করে হাসল।

সে চাইলে সবকিছু বন্ধুদের বলতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলল না। তার মনে হলো, এসব কথা বললে ওরা হয়তো তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কিংবা ভাববে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ল। সেই রাতটা তারা গল্প, হাসি আর আড্ডায় কাটিয়ে দিল।

সকাল হলে একে একে সবাই চলে গেল। কিন্তু রুদ্র আর বিষয়টাকে সহজভাবে নিতে পারল না। পরদিন রাতে অফিসে যাওয়ার আগে সে অনেকক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুই ঘটল না।

তবুও তার মনে হতে লাগল, আয়নাটা যেন তাকে লক্ষ্য করছে।

* * * * * * *

পরদিন অফিস থেকে ফিরে রুদ্র সরাসরি বাড়ির কেয়ারটেকারের কাছে গেল।
— "কাকু, এই ফ্ল্যাটটা নিয়ে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"
কেয়ারটেকার তার দিকে তাকালেন।
— "কী কথা?"

রুদ্র একটু ইতস্তত করে বলল,
— "এই ফ্ল্যাটে আগে কে থাকতেন?"

প্রশ্নটা শুনেই কেয়ারটেকারের মুখের রং বদলে গেল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,
— "কেন?"

— "এমনিই জানতে চাইছি।"

কেয়ারটেকার আর কোনও উত্তর দিলেন না। বরং বিরক্ত গলায় বললেন,
— "কোনও গুজব শুনবেন না, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি নিজের মতো থাকুন।"

— "কিন্তু... গুজব—"

— "বললাম তো, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না!"
কেয়ারটেকার প্রায় তাকে সেখান থেকে তাড়িয়েই দিলেন।

রুদ্রর সন্দেহ এবার আরও বেড়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে তার মনে হলো, এই ফ্ল্যাটকে ঘিরে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য রয়েছে। সে ঠিক করল, আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। খোঁজখবর নিতে গিয়ে রুদ্র জানতে পারল, একজন বৃদ্ধা বহু বছর ধরে এই বাড়িতে থাকেন। তিনি খুব একটা বাইরে বের হন না।
রুদ্র তাঁর কাছে গেল। দরজায় কড়া নাড়তেই কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল।
বৃদ্ধা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,
— "কী হয়েছে?"

রুদ্র ধীরে ধীরে বলল, — "আমি চারতলার ওই ফ্ল্যাটে থাকি। একটা ব্যাপারে জানতে এসেছি।"

বৃদ্ধার চোখে হঠাৎ অদ্ভুত ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।
— "তুমি... ওই ফ্ল্যাটে থাকো?"

রুদ্র অবাক হয়ে বলল, — "হ্যাঁ।"

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ রুদ্রর হাত ধরে তাকে ঘরের ভেতরে টেনে নিলেন। দরজা বন্ধ করে ফিসফিস করে বললেন, — "তুমি জানো না, ওই ফ্ল্যাটে কী হয়েছিল!"

রুদ্রর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। — "কী হয়েছিল?"

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, — "আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে তোমার মতোই একটা ছেলে ওই ফ্ল্যাটে থাকতে এসেছিল। নাম ছিল অভি। প্রথম দিকে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু কয়েক দিন পর সে সবাইকে বলতে শুরু করল, তার ঘরের আয়নায় সে অদ্ভুত কিছু দেখতে পায়।"

রুদ্র চুপ করে শুনতে লাগল। বলল — "কী দেখতে পেত?"

বৃদ্ধা গলা নামিয়ে বললেন, — "কাউকে... নিজের মতো দেখতে একজনকে।"

রুদ্রর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

বৃদ্ধা আবার বলতে শুরু করলেন,
— "কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। সবাই ভাবত, ছেলেটা হয়তো পাগল হয়ে গেছে। তারপর একদিন দেখা গেল, অভি কয়েক দিন ধরে ঘর থেকে বেরোচ্ছে না।"
বৃদ্ধার গলা কেঁপে উঠল। — "সবাই মিলে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিল। আর..."
— "আয়নার সামনে অভিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।"

রুদ্রর শরীর শিউরে উঠল। — "তারপর আয়নাটার কী হয়?"

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, — "অভির সব জিনিসপত্র ওর বাড়ির লোক নিয়ে যায়। কিন্তু ওই আয়নাটা..." তিনি আবার থেমে গেলেন।

রুদ্র বলে উঠলো —"আয়নাটা কী?"

বৃদ্ধা বললেন, —"ওটা মনে হয় এই ফ্ল্যাটেই রয়ে গিয়েছিল।"

রুদ্রর মুখ শুকিয়ে গেল। —"তার মানে... যে আয়নাটা এখনও ওই ফ্ল্যাটেই আছে?"

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। — "হ্যাঁ। কেন, তোমার কি কিছু মনে হয়েছে? কিছু দেখেছ?"

রুদ্র কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল,
— "অনেক ধন্যবাদ। আমি এবার আসি।"
বৃদ্ধা শুধু মাথা নাড়লেন। রুদ্র দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেদিন রাতে ভয় লাগলেও রুদ্র নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেল। ঘরে ঢুকে সে সরাসরি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ সে লক্ষ করল—
রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার প্রতিবিম্ব... বসে আছে!

রুদ্রর শরীর অবশ হয়ে গেল। তার মুখ শুকিয়ে গেল। হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। সে পকেট থেকে লেজার লাইট বের করতে গেল। কিন্তু আতঙ্কে তার হাত কেঁপে উঠল, আর লেজার লাইটটি মেঝেতে পড়ে গেল।

প্রতিবিম্বটি তখনও বসে আছে। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসি।

সেই দিন থেকেই রুদ্রর মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরতে লাগল— এই আয়নার রহস্য কী?
সে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তাহলে এমন ঘটনা কীভাবে সম্ভব? নাকি সবটাই তার মনের ভুল? কিন্তু যতবারই সে আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়, ততবারই অনুভব করে, আয়নাটার প্রতি তার এক অদ্ভুত আকর্ষণ তৈরি হয়েছে।

দিন দিন সে আরও বেশি সময় ওই আয়নার সামনে কাটাতে শুরু করল। এভাবেই দিন কেটে যেতে লাগল। রুদ্র যে ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারল না। একসময় অফিসে যাওয়াও বন্ধ করে দিল সে। দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকত। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও করত না।

তার চোখের নিচে কালি পড়ে গেল। মুখ শুকিয়ে গেল।
সে শুধু আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকত। কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা।

* * * * * * *

একদিন হঠাৎ রুদ্রর ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল আরোহী।
আরোহী রুদ্রর অফিসের নতুন সহকর্মী। অফিসে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন থেকেই রুদ্রকে তার ভালো লেগেছিল। কিন্তু রুদ্র বেশ চুপচাপ স্বভাবের হওয়ায় তাদের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। রুদ্র অনেক দিন অফিসে না আসায় আরোহী চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা জোগাড় করে সে রুদ্রর বাড়িতে চলে এল।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। আরোহী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার।
— "রুদ্র?"

কোনও উত্তর এল না। আরও ভেতরে ঢুকবে কি না, একবার ভেবে নিল আরোহী। তারপর সাহস করে ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ল। আরোহী আলো জ্বালল।

তারপর রুদ্রকে দেখেই আঁতকে উঠল।
রুদ্র বিছানার পাশে বসে আছে। তার চেহারা শুকিয়ে কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে। চোখের নিচে গভীর কালি। মুখ রুক্ষ ও শুষ্ক। তার আচরণও আর স্বাভাবিক নেই।

আরোহী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল, — "রুদ্র! তোমার কী হয়েছে?"

রুদ্র ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল,
— "ও আমাকে ওখানে আটকে রাখতে চাইছে..."

আরোহী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, — "কে? কোথায় আটকে রাখতে চাইছে?"

রুদ্র কাঁপা হাতে আয়নার দিকে ইশারা করল। — "ওখানে..."

আরোহী আয়নার দিকে তাকাল। কিন্তু সেখানে অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়ল না। রুদ্র তখনও বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে।আরোহী তার হাত ধরে টেনে তুলতে গেল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, রুদ্রর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। — "তোমার তো প্রচণ্ড জ্বর!"
আরোহীর মনে হলো, হয়তো জ্বরের ঘোরেই রুদ্র এসব ভুলভাল কথা বলছে।

সে কোনওভাবে রুদ্রকে আয়নার সামনে থেকে সরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর তার কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রুদ্র ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আরোহীর মনে তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল
— রুদ্রর আসলে কী হয়েছে?

আরোহী একজন ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে আনল। ডাক্তার রুদ্রকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে কিছুটা চিন্তিত গলায় বললেন, — "এঁর এমন অবস্থা কীভাবে হলো?"

আরোহী বলল, — "জ্বর হয়েছে। কয়েক দিন ধরে নাকি খুব ভয়ও পাচ্ছিলেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। — "শুধু সাধারণ জ্বর থেকে এমন অবস্থা হওয়া অস্বাভাবিক। আপনি ওঁর একটু বেশি খেয়াল রাখবেন। আমার কাছে ওঁর অবস্থা পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।"

কথাগুলো বলে ডাক্তার চলে গেলেন। আরোহী ঠিক বুঝতে পারছিল না, কী করা উচিত। কিছুক্ষণ ভেবে সে ঠিক করল, এই অবস্থায় রুদ্রকে একা ফেলে চলে গেলে হয়তো ছেলেটা আর বাঁচবেই না। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, কী করতে হবে। এই অবস্থায় রুদ্র কে ছেড়ে গেলে সে হয়তো বাঁচবে না

প্রথমেই অফিসে একটি ই-মেল পাঠিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়ে নিল সে।

* * * * * * *

আরোহী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুদ্রর দেখাশোনা করতে লাগল। এভাবেই দুদিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে রুদ্র কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। আরোহী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, যাতে সে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে তার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু রুদ্র কিছুতেই ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে রাজি হলো না।

আরোহী লক্ষ করল, রুদ্র যখনই ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার দিকে তাকায়, তখনই যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার মধ্যে এক ধরনের ভয়ও কাজ করতে থাকে। রুদ্র কখনো কখনো বিড়বিড় করে বলতে থাকে,
— "ও আমায় আটকে রাখতে চায়..."

আরও একটা বিষয় আরোহীর নজরে এল। রুদ্র মাঝেমধ্যেই একটা ডায়েরিতে কিছু না কিছু লিখত। আরোহী ডায়েরিটা দেখতে চাইলে রুদ্র কিছুতেই তাকে সেটা দেখতে দিত না।

এভাবেই আরও দুদিন কেটে গেল। এই কয়েক দিনে রুদ্ররও আরোহীর প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আরোহী তাকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে এই ফ্ল্যাটে আর থাকা যাবে না।

অবশেষে রুদ্র রাজি হলো। ঠিক হলো, পরদিন সকালে আরোহী এসে রুদ্রর সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবে। তারপর তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে।

পরদিন সকালবেলা আরোহী রুদ্রকে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য তার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হলো। দরজা দিয়ে ঢুকেই আরোহী লক্ষ করল, রুদ্র আয়নার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নায় তার প্রতিবিম্বও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বের মুখে ফুটে রয়েছে এক অদ্ভুত পৈশাচিক হাসি।

আরোহী রুদ্রর মুখের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত ভালো করে লক্ষ করার পর তার মনে হলো, হাসিটা যেন রুদ্রর নিজের নয়, বরং আয়নার ভেতরে থাকা তার প্রতিবিম্বের।

— "রুদ্র!" আরোহী জোরে ডেকে উঠল।

তার ডাকে রুদ্র যেন হঠাৎ ঘোর থেকে জেগে উঠল। সে আরোহীর দিকে ফিরে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,
— "তুমি কখন এলে?"

— "এই তো, একটু আগেই। কী দেখছিলে অমন করে?"

রুদ্র কোনও উত্তর দিল না।

আরোহী আর কথা না বাড়িয়ে তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলল। তারপর রুদ্রর জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু রুদ্রর চোখ আবার গিয়ে পড়ল আয়নার দিকে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

আয়নায় তার প্রতিবিম্বটিও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আবার সেই একই অদ্ভুত হাসি!

রুদ্র কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন কোনও অদৃশ্য শক্তির টানে আয়নার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন তার পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার শরীর কাঁপতে শুরু করল।

— “না... না... আমাকে ছেড়ে দাও!”
রুদ্রর কণ্ঠে আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঠিক তখনই— আয়নার ভেতর থেকে দুটি হাত বেরিয়ে এল! সেগুলো মুহূর্তের মধ্যে রুদ্রর গলা চেপে ধরল।
রুদ্র ছটফট করতে লাগল। গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছিল না। সে প্রাণপণে হাত দুটো সরানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অবশেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল।

এদিকে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে আরোহীর মনে হলো, বাইরের ঘর থেকে যেন রুদ্রর গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। সে ভেতরের ঘর থেকেই ডাকল, — “রুদ্র! রুদ্র, কী হয়েছে?”

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আবার একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেয়ে আরোহী আর স্থির থাকতে পারল না। ভয়ে বুক কাঁপতে থাকলেও সে দ্রুত বাইরের ঘরে ছুটে এল।

কিন্তু ঘরে এসে যা দেখল, তাতে সে হতবাক হয়ে গেল। রুদ্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে সেই একই পৈশাচিক হাসি।

— “রুদ্র!” আরোহীর ডাক শুনে রুদ্র তার দিকে ফিরে তাকাল।

পরমুহূর্তেই সবকিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। রুদ্র স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। কোনও হাত নেই। কোনও চিহ্ন নেই। কিছুই নেই।

আরোহী কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে কি সত্যিই কিছু দেখেছে, নাকি ভয়ে তার চোখের ভুল হয়েছে? কিন্তু তার মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ ইতিমধ্যেই রোপিত হয়ে গিয়েছিল। সে আর কোনও কথা না বলে বাকি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। মনে মনে ঠিক করল, এখন আর এক মুহূর্তও এই ফ্ল্যাটে থাকা যাবে না।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল বিছানার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা রুদ্রর সেই ডায়েরিটার দিকে। সে ডায়েরিটা তোলার জন্য হাত বাড়াতেই রুদ্র হঠাৎ তার হাত চেপে ধরল।
— “আরোহী... চলো। কী হচ্ছে এসব?”

আরোহী অবাক হয়ে রুদ্রর দিকে তাকাল। কিছু একটা ঠিক নেই।
প্রথমত, রুদ্র তাকে ডায়েরিটা তুলতে দিল না। অথচ ডায়েরিটা মেঝেতে পড়ে থাকলেও সে নিজে সেটি তোলার কোনও চেষ্টা করল না।
দ্বিতীয়ত, রুদ্রর জ্বর এখনও পুরোপুরি কমেনি। অথচ তার হাতটা ছিল অস্বাভাবিক ঠান্ডা— যেন বরফের মতো!
আর তৃতীয়ত, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে রুদ্র একবার আয়নার দিকে তাকাল। তারপর এমন এক পৈশাচিক হাসি হাসল, যা দেখে আরোহীর সারা শরীর শিউরে উঠল। সেই হাসিতে যেন কোনও মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির লেশমাত্র ছিল না।
আরোহী আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। সে রুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল।

আরোহী রুদ্রকে নিয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছল। এতক্ষণে তার বুকের ভেতর জমে থাকা আতঙ্ক কিছুটা কমেছে। মনে মনে ভাবল, অন্তত এই মুহূর্তে রুদ্রকে ওই অভিশপ্ত ফ্ল্যাট থেকে দূরে রাখতে পেরেছে সে।
— “তুমি এখানে বসো। আমি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছি,” বলল আরোহী।

রুদ্র চুপচাপ সোফায় বসে রইল। আরোহী রান্নাঘরে যাওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল। রুদ্রর দৃষ্টি তখনও স্থির হয়ে আছে সামনের দেওয়ালের দিকে। যেন সেখানে এমন কিছু রয়েছে, যা আরোহী দেখতে পাচ্ছে না।

— "রুদ্র, কী হয়েছে? আবার কী ভাবছ?"

রুদ্র ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল। — "কই, কিছু না তো!"
কথাটা স্বাভাবিকভাবেই বলল সে। অথচ তার মুখের অভিব্যক্তিতে এমন একটা শীতলতা ছিল, যা আরোহীকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

আরোহী নিজেকে বোঝাল, রুদ্র অসুস্থ। এত দিন ধরে ভয়ের মধ্যে থাকার কারণে তার আচরণে কিছু পরিবর্তন আসতেই পারে।

রাতে রুদ্রকে খেতে দিয়ে আরোহী তার ওষুধগুলো এগিয়ে দিল।
— "এই ওষুধগুলো খেয়ে নাও। তারপর ভালো করে ঘুমোবে। কাল সকালে তোমাকে আবার ডাক্তার দেখাব।"

রুদ্র ওষুধের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। — "ওষুধ খেয়ে কী হবে, আরোহী? আমার তো কিছুই হয়নি।"

আরোহী অবাক হয়ে গেল। — "কিছুই হয়নি মানে? তোমার শরীরের এই অবস্থা দেখেছ? তুমি কয়েক দিন ধরে অফিসে যাওনি, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করোনি। আর তুমি বলছ তোমার কিছু হয়নি?"

রুদ্র কোনও উত্তর দিল না। শুধু ওষুধগুলো টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল।
— "আমি একটু ঘুমোব।" এই বলে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

আরোহী ওষুধগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। রুদ্র আগে কখনও এমন ছিল না। সে চুপচাপ স্বভাবের হলেও নিজের শরীর নিয়ে এতটা উদাসীন ছিল না। আর আজকাল তার কথাবার্তার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ততা এসে গেছে।

রাত বাড়ল। আরোহী নিজের ঘরে শুয়ে থাকলেও তার চোখে ঘুম এল না। বারবার মনে পড়তে লাগল সেই ফ্ল্যাটের আয়নাটা, রুদ্রর গলা চেপে ধরা অদৃশ্য হাত দুটো আর তার মুখের সেই পৈশাচিক হাসি।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। খুব মৃদু একটা হাসির শব্দ। আরোহী বিছানা ছেড়ে উঠে বসল।
শব্দটা আবার শোনা গেল। এবার আর কোনও সন্দেহ রইল না। শব্দটা রুদ্রর ঘর থেকেই আসছে।

আরোহী ধীরে ধীরে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজাটা সামান্য ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে সে দেখল, রুদ্র বিছানায় শুয়ে নেই। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে জানালার বাইরে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কাচের ওপর। আর তার মুখে ফুটে রয়েছে সেই অদ্ভুত হাসি।

আরোহীর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় ডাকল, — "রুদ্র?"

রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। — "কী হয়েছে?"
আরোহী কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, — "তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে?"
— "কিছু না। ঘুম আসছিল না, তাই জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।"

রুদ্রর উত্তর শুনে আরোহী আর কিছু বলল না। কিন্তু তার মনে একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরতে লাগল, জানালার কাচে এমন কী দেখছিল রুদ্র, যার জন্য তার মুখে ওই হাসি ফুটে উঠেছিল?

পরদিন সকালে আরোহী চা বানিয়ে রুদ্রকে দিতে গেল।
— "রুদ্র, আজ তোমাকে আবার ডাক্তার দেখাতে হবে। আর তোমার অফিসেও খবর দেওয়া দরকার।"

রুদ্র চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল,
— "আমার অফিসে খবর দেওয়ার দরকার নেই। ডাক্তার কেও ডাকতে হবে না"

— "তুমি ঠিক আছ কি না, সেটা তুমি বুঝতে পারছ না!" কথাটা বলতে গিয়েই আরোহী থেমে গেল।

রুদ্র ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল। — "কী বলতে চাইছ তুমি?"
আরোহী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, — "কিছু না। তুমি চা খাও।"
কিন্তু মনে মনে সে বুঝতে পারছিল, সমস্যাটা শুধু রুদ্রর অসুস্থতা নয়। তার আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন এসেছে, যা সাধারণ অসুস্থতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সকালে রুদ্র যখন বাথরুমে গেল, তখন আরোহী তার ব্যাগের মধ্যে রাখা ওষুধগুলো দেখতে গিয়ে একটা ছোট কাগজ খুঁজে পেল। কাগজটায় কাঁপা হাতে লেখা কয়েকটি শব্দ— "ও আমার জায়গা নিতে চাইছে।"

আরোহীর হাত থেকে কাগজটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কথাগুলো কার লেখা? রুদ্রর? নাকি অন্য কারও?
তার মনে পড়ল, ফ্ল্যাটে থাকার সময় রুদ্র বারবার বলেছিল, কেউ তাকে আটকে রাখতে চাইছে। কিন্তু যদি সেই কথার অর্থ অন্য কিছু হয়? আরোহীর সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। ভেতর থেকে জলের শব্দ আসছে।

রুদ্র বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই আরোহী কাগজটা লুকিয়ে ফেলল।
আরোহী রুদ্রর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ— সেই চোখ দুটো তার চেনা। মুখটাও চেনা। অথচ কোথাও যেন একটা অমিল রয়েছে।
সেদিন দুপুরে রুদ্র ঘুমিয়ে পড়ার পর সে একা বসে অনেকক্ষণ ভাবল। আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাকে জানতে হবে, ওই ফ্ল্যাটে আসলে কী ঘটেছিল। আয়নার রহস্য কী। আর রুদ্রর সঙ্গে ঠিক কী হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিল, আবার ওই ফ্ল্যাটে ফিরবে। একা হলেও ফিরবে।
সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তাকে আবার সেই আয়নার সামনে দাঁড়াতেই হবে।

* * * * * * *

পরদিন আরোহী আবার একাই রুদ্রর ফ্ল্যাটে ফিরে এল।
তার মাথায় তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছিল— ডায়েরিটায় কী লেখা আছে?

সে ডায়েরিটা খুঁজে পেল। তাড়াতাড়ি সেটি খুলতেই তার চোখ আটকে গেল একটি লেখায়।
সে পড়তে শুরু করল— "এই আয়নাটি আমাকে বন্দি করতে চায়। আমার বদলে সে বাইরে আসতে চায়। আমি যত দুর্বল হয়ে পড়ছি, আয়নাটি ততই আমাকে নিজের ভিতরে টেনে নিচ্ছে।"

লেখাটা পড়ে আরোহীর বুক কেঁপে উঠল। এক মুহূর্তে সবকিছু যেন পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। সে যাকে রুদ্র ভেবে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে... সে আসলে রুদ্র নয়! আসল রুদ্র এখনও আয়নার ভিতরে বন্দি!

আরোহী ডায়েরির পাতাটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। তবু সে পিছিয়ে গেল না। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, শুধু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। আসল রুদ্রকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সে ধীরে ধীরে ডায়েরিটা বন্ধ করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই আয়নার সামনে। ঘরের নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল। আরোহী নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে থেকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও, এখন সে জানে, এই আয়নার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়ংকর রহস্য।

তার মাথায় তখন শুধু একটা প্রশ্ন—
কীভাবে আসল রুদ্রকে ফিরিয়ে আনা যায়?

* * * * * * * *

পরদিন আরোহী সবকিছু স্বাভাবিক রাখল। নকল রুদ্র যেন কিছুই বুঝতে না পারে, সেভাবেই তার সঙ্গে আচরণ করতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে তাকে বোঝাল,
— "তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে তোমার কিছু জিনিস নিয়ে আসতে হবে।"

নকল রুদ্র কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, — "চলো।"

দুজন আবার সেই ফ্ল্যাটে ফিরে গেল। ঘরে ঢুকতেই আরোহীর চোখ গেল আয়নার দিকে। আয়নাটা যেন আগের চেয়ে আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। আরোহী বুঝেছিল, আয়নার সামনে দাঁড়ালে দুর্বল মানুষটিকে সেটি নিজের ভিতরে বন্দি করে ফেলে। কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম।

সে ধীরে ধীরে নকল রুদ্রকে আয়নার সামনে নিয়ে গেল। আয়নার কাছে যেতেই নকল রুদ্রর আচরণ বদলে গেল। তার মুখে অস্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠল।

ঠিক তখনই আয়নার ভেতরে আসল রুদ্রকে দেখা গেল। সে দুহাত দিয়ে আয়নার কাচে ধাক্কা মারছে। তার মুখে আতঙ্ক স্পষ্ট, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে সে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনওভাবেই পারছে না।

আয়নার ওপার থেকে রুদ্রর চাপা চিৎকার ভেসে এল,
— "আরোহী! আমাকে বাঁচাও! আমি এখান থেকে বেরোতে পারছি না!"
আরোহী এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। এত দিন ধরে যে মানুষটিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, সেই মানুষটিরই আরেকটি রূপ এখন কাচের ওপারে বন্দি!

— "রুদ্র! তুমি পারবে! হাল ছেড়ো না! জোরে ধাক্কা দাও!"
আরোহীর গলার আওয়াজে আয়নার ভেতরের রুদ্র যেন নতুন করে সাহস পেল। সে পিছিয়ে গিয়ে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর ছুটে এসে দুহাতে আয়নার গায়ে ধাক্কা মারল।

ধাক্কায় আয়নাটা কেঁপে উঠল। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়ল, যেন কাচের আড়ালে কেউ ভারী দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

এদিকে নকল রুদ্রর মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তার চোখেমুখে প্রথমবারের মতো আতঙ্ক ফুটে উঠল। — "না... এটা হতে পারে না!"

তার গলা শুনে আরোহী চমকে তার দিকে তাকাল। নকল রুদ্র নিজের গলা চেপে ধরে হাঁপাতে লাগল। তার শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন সে ঠিকমতো সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না।

সে কোনওমতে আয়নার দিকে হাত বাড়াল, যেন ভেতর থেকে কোনও শক্তি টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এবার যেন সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আরোহী এবার বিষয়টা বুঝতে পারল।
আয়নার নিয়ম একটাই— যে দুর্বল, তাকেই আয়না বন্দি করে।

এত দিন আসল রুদ্র ভয় আর অসহায়তায় ভেঙে পড়েছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আয়না তাকে নিজের ভেতরে বন্দি করেছিল। আর তার জায়গা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল নকল রুদ্র। কিন্তু এবার পরিস্থিতি বদলে গেছে। আসল রুদ্র জানে, বাইরে বেরোতে না পারলে তাকে চিরকাল ওই আয়নার ভেতরেই বন্দি থাকতে হবে। তাই সমস্ত ভয়কে দূরে সরিয়ে সে প্রাণপণে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, নকল রুদ্র বুঝতে পারছে, তার শক্তি ক্রমশ কমে আসছে। সে মরিয়া হয়ে আয়নার দিকে এগিয়ে গেল।

— "থামো! বেরোতে পারবে না তুমি!"
তার কণ্ঠে এবার আর আগের সেই আত্মবিশ্বাস নেই। বরং কথাগুলোর মধ্যে অসহায়তা আর আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আয়নার ভেতরের রুদ্র আবার দুহাতে কাচের ওপর আঘাত করল। ধাম! -ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ হলো।

আরোহী ভয়ে দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরল। আয়নার কাচের ওপর চিকন চিকন রেখা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। প্রথমে একটি, তারপর তার পাশেই আরও কয়েকটি। রেখাগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। নকল রুদ্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার শরীর থেকে যেন সমস্ত শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে।

আরোহী বুঝতে পারল, এটাই শেষ সুযোগ। — "রুদ্র! আর একবার চেষ্টা করো! তুমি পারবে!"

আয়নার ভেতরের রুদ্র শেষবারের মতো পিছিয়ে গেল। তার মুখে তখন প্রবল সংকল্প। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে— আয়নার ভেতরে প্রচণ্ড আলো ঝলসে উঠল।
এক মুহূর্তের মধ্যে নকল রুদ্র যেন আয়নার দিকে টেনে নেওয়া হলো। আর একই সঙ্গে—
আয়নার ভেতর থেকে আসল রুদ্র ছিটকে বাইরে এসে মেঝেতে পড়ল।

আরোহী ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। — "রুদ্র!"
রুদ্র হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ খুলল। — "আরোহী... আমি... বাইরে?"
— "হ্যাঁ। তুমি বাইরে।"

ঠিক তখনই আয়নাটায় ফাটল ধরল। একটি ফাটল। তারপর আরেকটি। তারপর অসংখ্য ফাটল ছড়িয়ে পড়ল গোটা আয়নাজুড়ে। পরের মুহূর্তেই— ঝনঝন শব্দে আয়নাটি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

* * * * * * *

রুদ্র আর কোনও দিন পিছনে ফিরে তাকাল না। সেই ফ্ল্যাটও ছেড়ে দিল সে। অন্যত্র নতুন করে জীবন শুরু করল।
ধীরে ধীরে তার জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বন্ধু শুভ, নিলয় আর প্রীতি— সবাই ফিরে এল তার জীবনে। আরোহীও থেকে গেল তার পাশে।
কখনও কখনও রাতে ঘুম ভেঙে উঠে রুদ্র ভাবত
—সত্যিই কি সব শেষ?

তারপর নিজেকেই বোঝাত, "হ্যাঁ, আয়নাটা তো ভেঙে গেছে।"

কিন্তু এক রাতে ঘুমানোর আগে নিজের ঘরের জানালার কাচে চোখ পড়তেই রুদ্র হঠাৎ থমকে গেল।

কাচে তার প্রতিবিম্ব দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবিম্ব তা কি হাসছে ?
রুদ্র হাত তুলল। প্রতিবিম্বও হাত তুলল।

একসঙ্গে। রুদ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আলো নিভিয়ে দিল।

= = সমাপ্ত = =



হিমালয়ের কোলে, চীন সীমান্তের কাছাকাছি সিকিমের বিখ্যাত টেমি টি গার্ডেন। শীত এখানে শুধু একটি ঋতু নয়, যেন পাহাড়ের নিজস্ব স্বভাব। হঠাৎ করেই নেমে আসতে পারে তুষারপাত, আর ঘন কুয়াশা কখন যে পাহাড়কে গিলে খায়, তা বোঝার উপায় নেই।

এই চা-বাগানের নতুন ম্যানেজার হিসেবে এসেছেন সুব্রামনিয়াম আইয়ার। দক্ষিণ ভারতের মানুষ তিনি—সংযত স্বভাবের, কম কথা বলেন। গ্রামের কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই অভ্যাসবশত বলে ওঠেন, "Yes, please!" ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, তবু নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর।

সুব্রামনিয়াম আইয়ারের স্ত্রী মীনাক্ষী আইয়ার শান্ত স্বভাবের মানুষ। তিনি নিয়মিত পূজাপাঠ করেন। তাঁদের ছেলে ভেঙ্কটেশ, যাকে সবাই ভিকি বলে ডাকে, তার বয়স সাত বছর। মেয়ে রাজেশ্বরীর ডাকনাম রাই। তার বয়স নয়। দুজনেই ভীষণ কৌতূহলী। পাহাড়ে তারা এসেছে এই প্রথম। আর তুষারপাত? সে তো তাদের কাছে একেবারে রূপকথার মতো!

এত ঠান্ডা যে হতে পারে, তা তারা আগে কখনও অনুভব করেনি। তাঁদের থাকার কাঠের বাংলোটি বেশ সাজানো-গোছানো। যেদিকেই তাকানো যায়, চোখে পড়ে মনোরম বনভূমি আর পাহাড়ের অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। বাংলোর পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে একটি খরস্রোতা নদী। তার কলকল শব্দ পাহাড়ের নীরবতাকে আরও মায়াময় করে তোলে। নদীর ধারে পাথরের খাঁজে খাঁজে জমে আছে বরফশীতল জল। সেখানে পা ছোঁয়ালেই মনে হয়, যেন শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের ঝটকা লাগল!

কিন্তু পাহাড় যেমন রূপকথার মতো সৌন্দর্য উপহার দেয়, তেমনই কখনও কখনও কঠিন পরীক্ষার মুখেও দাঁড় করায়।

সেদিন সকালটা ছিল অন্য দিনের চেয়ে আলাদা। সারা রাত ধরে তুষারপাত হয়েছে। টেমি টি গার্ডেনের ধাপে ধাপে নেমে আসা ঢালগুলো সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে। চারদিকে যেন এক মায়াবী সাদা রাজ্য! সুব্রামনিয়াম আইয়ার খুব ভোরেই চা-বাগান পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, মীনাক্ষী তখন পূজায় বসেছেন।

এই সময় জানালার বাইরে তাকিয়ে রাই হঠাৎ বলে উঠল, "ভিকি, চল, আজ আমরা নিজেরাই বাবার অফিসে যাই। মাকে কিছু বলব না। বাবাকে একটা সারপ্রাইজ দেব!"

কিছুটা দূর এগোনোর পর চারপাশে ঘন কুয়াশা নেমে এল। পথঘাট ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ভিকি ভয়ে ভয়ে বলল, "চল দিদি, এবার বাড়ি ফিরে যাই। মা চিন্তা করবে।"

কিন্তু রাইয়ের জেদ ভীষণ! সে একবার যা ঠিক করে, তা করেই ছাড়ে। "না, আমরা বাবার অফিসে যাবই!" দিদির জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানল ভিকি। অগত্যা সেও দিদির সঙ্গ নিল।

তুষারে ঢাকা পথ ধরে, পাহাড়ি বনের গা ছমছমে পরিবেশকে উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে চলল বাবার অফিসের দিকে। আকাশে কালো মেঘ, তার সঙ্গে মিহি তুষারপাত। চারপাশে ঘন কুয়াশা। পাহাড়ি পথগুলো ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছিল। একসময় পথ চিনতে ভুল করল তারা। বাবার অফিসের বদলে পৌঁছে গেল এক অদ্ভুত শৈত্যনগরীতে!

দুজনের চোখের পাতায় জমে উঠেছে ঝুরঝুরে বরফ। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল, পথ হারিয়ে ফেলেছে। তবু কোথা থেকে যেন এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে চলেছে সেই রহস্যময় নগরীর দিকে। অজানা এক কৌতূহল আর সাহস বুকে নিয়ে তারা প্রবেশ করল শৈত্যনগরী হিমশিখরে।

নগরীর ভেতরে ঢুকতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তারা। কী সুন্দর সাজানো-গোছানো এক মহল! পরিপাটি বৈঠকখানা, বাইরের মহল, ভেতরের মহল— সবকিছু যেন নিখুঁতভাবে সাজানো। বাহারি ফুলের মনকাড়া সাজে সজ্জিত অফিসঘর, শয়নকক্ষ, এমনকি রান্নাঘরও। মনে হচ্ছিল, কোনো এক রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছে তারা।

কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক অজানা রহস্য।

মহলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল তাদের হাত-পা। বাইরে তখনও তুষারপাত চলছে। ঠান্ডা যেন শরীরের প্রতিটি কোষে ঢুকে পড়ছে। অথচ সারাদিন ধরে তারা শুধু একের পর এক ঘরের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াল। কোথাও কাউকে দেখা গেল না, কোথাও কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল ভিকি আর রাই। এত সুন্দর, অথচ এত নিঃসঙ্গ এই মহল! তারা কি আর কখনও বাড়ি ফিরতে পারবে? নাকি হিমশিখরের এই রহস্যময় গোলকধাঁধায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে?

এদিকে বাংলোয় তখন হুলস্থুল কাণ্ড! রাই আর ভিকিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও যখন তাদের কোনো সন্ধান মিলল না, তখন মীনাক্ষীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ফোন করলেন স্বামীকে।

"শোনো, ওরা কোথাও নেই! সারা বাংলো খুঁজেছি, আশপাশেও খুঁজেছি। কোথায় গেল ওরা? এখন আমি কী করব?"

ফোনের ওপার থেকে সুব্রামনিয়াম আইয়ার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি শান্ত হও, মীনাক্ষী। কান্না থামাও। আমি দেখছি। ওদের কিছু হবে না। আমি এখনই ফিরছি।"

কিন্তু বাবার মনও তখন আশঙ্কায় ভরে উঠেছে। তুষারপাত উপেক্ষা করে পরিচিত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ছেলে-মেয়ের সন্ধানে। বরফে ঢাকা পাহাড়ি পথ ধরে চলতে চলতে বারবার ডাকতে লাগলেন, "রাই! ভিকি! তোমরা কোথায়? বাবা এসেছি! তোমরা সাড়া দাও!"

কিন্তু চারদিকে শুধু হিমেল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর তুষারপাতের নিঃশব্দ বিস্তার। কোনো উত্তর নেই।

এদিকে সন্তানদের চিন্তায় মীনাক্ষীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে একসময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

এমন সময় চারদিকে কানাঘুষো শুরু হলো এক রহস্যময় স্থানকে নিয়ে— সেই শৈত্যপুরী!

স্থানীয় কয়েকজন ভয়ে ভয়ে বলতে লাগল, "ওরা কি তবে হিমশিখরের দিকে চলে গেছে?"

আরেকজন চাপা গলায় বলল, "ওই শৈত্যপুরীতে একবার কেউ ঢুকলে আর সহজে ফিরে আসতে পারে না। কত মানুষের প্রাণ যে সেখানে গেছে, তার হিসাব নেই!"

কথাগুলো শুনে সুব্রামনিয়ামের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। তবে কি তাঁর আদরের দুই সন্তানও সেই অভিশপ্ত শৈত্যপুরীতে হারিয়ে গেছে?

এদিকে ভিকি আর রাইয়ের সুন্দর, কোমল মুখ দুটির ওপর যেন আকাশের কালো মেঘের ছায়া নেমে এসেছে। এত বড় রাজপ্রাসাদ, অথচ কোথাও কারও দেখা নেই! চারদিকে নিস্তব্ধতা, যেন গোটা প্রাসাদটাই কোনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কাঠের দেওয়ালজুড়ে টাঙানো রয়েছে অসংখ্য সুন্দর তৈলচিত্র। প্রতিটি ছবিতে ফুটে উঠেছে অপূর্ব শিল্পকুশলতা। প্রাসাদের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রয়েছে অসাধারণ কারুকার্য। বৈভব আর সৌন্দর্যের কোনো অভাব নেই। তবু কোথায় গেল এখানকার মানুষজন? এত বড় প্রাসাদে কি কেউই থাকে না?

প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে তাদের মনে ভিড় করতে লাগল। কিন্তু উত্তর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।

এদিকে প্রচণ্ড ঠান্ডা, ক্লান্তি আর সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল দুই ভাইবোন। একসময় আর চোখের পাতা মেলে রাখতে পারল না তারা। রহস্যময় সেই প্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল রাই আর ভিকি। দেখতে দেখতে দুজনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে যখন ঘোর কাটল, রাই আর ভিকি চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু এ কী! এ তো সেই রহস্যময় রাজপ্রাসাদ নয়! চারদিকে সারি সারি শয্যা। তারা দুজন শুয়ে আছে হাসপাতালের পাশাপাশি দুটি বেডে।

দুই বেডের আশপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা, বাবা আর প্রতিবেশীরা। মীনাক্ষীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ, সুব্রামনিয়ামের মুখে ক্লান্তি আর স্বস্তির মিশ্র অনুভূতি। সবাই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাদের জ্ঞান ফেরার।

রাই একবার মায়ের দিকে, একবার বাবার দিকে তাকাল। ভিকিও বিস্মিত চোখে চারপাশটা দেখল। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না, কীভাবে তারা সেই রহস্যময় হিমশিখর থেকে এখানে এসে পৌঁছাল!

কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে? কোনটা বাস্তব, আর কোনটা শুধুই স্বপ্ন? সেই অপূর্ব রাজপ্রাসাদ, দেওয়ালজোড়া তৈলচিত্র, নিস্তব্ধ ঘর আর অদ্ভুত শীতলতা—সব কি তবে কল্পনা?

কোনো প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পেল না তারা। শরীর তখনও দুর্বল, চোখের পাতা ভারী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাই আর ভিকি আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

= = সমাপ্ত = =

कविता १

कृष्ण विवर



तेरी हर मुस्कान से जगमगाएँ मेरे गहरे अँधेरे।

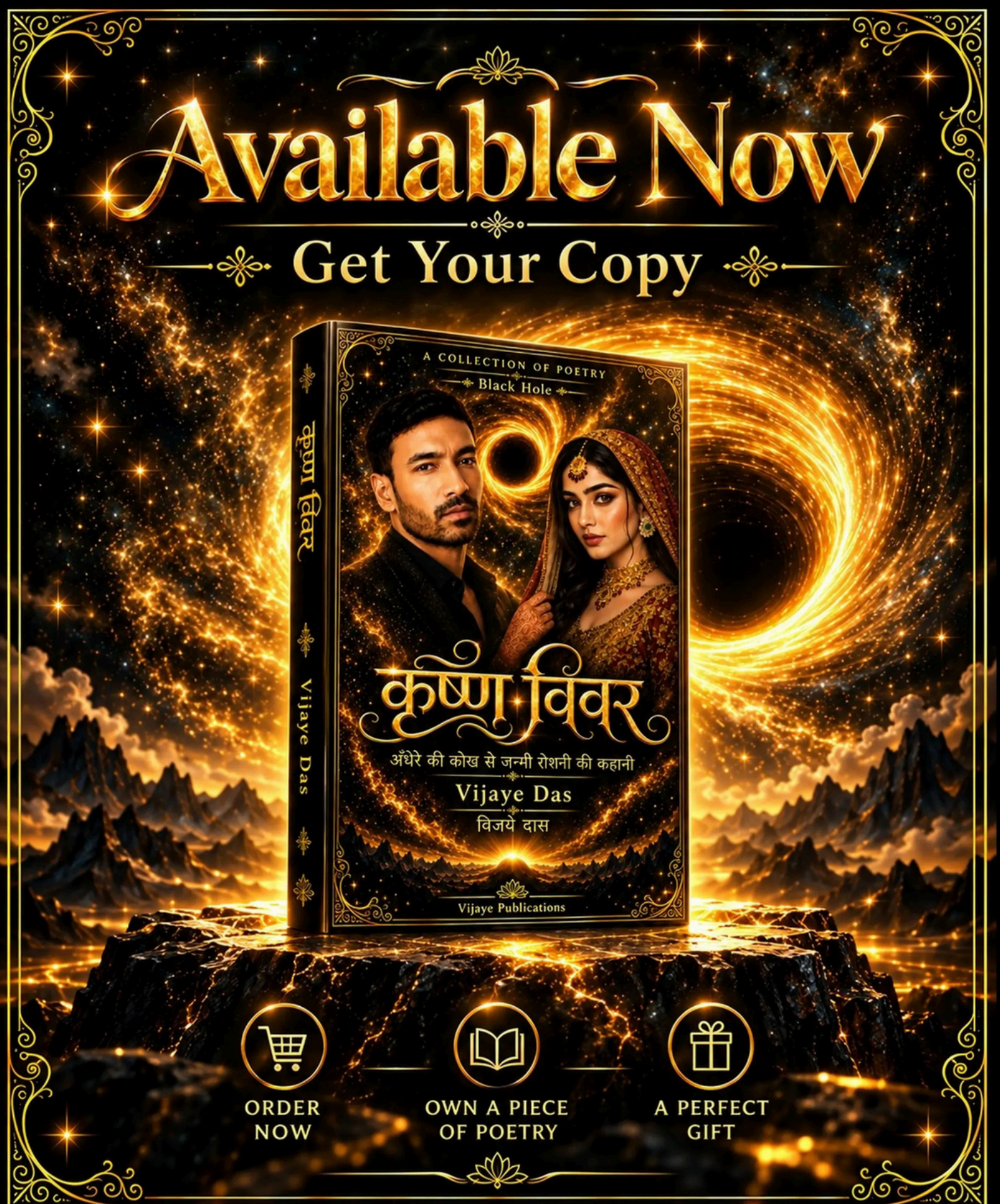
ज़िंदगी के सारे अँधेरे समेटकर
मैंने एक तारे में पिरोया,
उस तारे को निगलकर
मैं कृष्ण विवर बन गया।

मासूम था,
नादान था जो माना—
रोशनी ही है सच सबसे बड़ा।
पर अँधेरा—
आधा ही नहीं,
ब्रह्मांड का गहरा सच है यही।

रोशनी सिर्फ़ तारों की है झलक,
अँधेरे के माथे पर जड़ा विजय-तिलक।

अँधेरे सच्चे हैं,
अँधेरे अच्छे हैं,
अनंत आकाश अँधेरों से ही हैं भरे,
तभी तो तेरे तारे सुंदर हैं सारे।

तेरी हर मुस्कान से जगमगाएँ मेरे गहरे अँधेरे।



कृष्ण विवर
अँधेरे की कोख से जन्मी रोशनी की कहानी।

कृष्ण विवर (Black Hole) is an experimental Hindi poetry collection by poet Vijaye Das, where rich symbolism and visual poetry bring words to life. Experience a soulful journey through love, separation, darkness, and transformation, woven together through vivid metaphors and evocative imagery. Available now on Amazon.



মানসিকতা

অয়ন দাস

মনের মাঝে যেমন ভাব, জগৎ তেমন সাজে,
আলোর খোঁজে চললে তুমি, জয়ী হবে সব কাজে।
দুঃখ আসুক, ঝড় আসুক,
মন যদি কয়– ‘পারব আমি’, জাগবে নতুন আশা,
নিজের মনের আকাশটাকে মুক্ত করো আজ,
মানসিকতার বদল হলেই বদলে যাবে কাজ।



সেদিন ভূত চতুর্দশীর রাত। তানিশা, তার ছোট ভাই তিয়াস এবং রাজ— তিনজনে মিলে রাতে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। চারদিক বেশ অন্ধকার। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তানিশাকে ডাকল, "তানিশা!"
তানিশা সাইকেল থামিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না।
রাজ জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে রে তানিশা? হঠাৎ সাইকেল থামালি কেন?"
তানিশা একটু ভয় পেয়ে বলল, "কেউ যেন পিছন থেকে আমাকে ডাকল। কিন্তু পিছনে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না!"

তারা আবার সাইকেল চালাতে শুরু করল। কিন্তু কিছুদূর যেতেই তানিশার সাইকেলের চেন খুলে পড়ে গেল।
তিয়াস বিরক্ত হয়ে বলল, "উফ্! আজই চেনটা খুলে পড়তে হলো! খুব ভয় করছে রে দিদি। এবার কী হবে?"
তানিশা বলল, "দাঁড়া, আমি রাজকে বলছি।"
তারপর সে রাজকে ডাকল, "রাজ, এদিকে আয় না! আমার সাইকেলের চেনটা তুলে দে তো!"
রাজ এগিয়ে এসে বলল, "আরে, আমিও তো সাইকেলের চেন তুলতে পারি না!"

এমন সময় তিয়াস দূরে একটা শ্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই দেখ! শ্যাওড়া গাছটার কাছে একটা সাদা শাড়ি পরা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে! তোরা দেখতে পাচ্ছিস?"
তানিশা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ রে! কিন্তু ওখানে যেতে আমার খুব ভয় করছে।"
রাজ বলল, "চল, ডেকেই দেখি। যদি উনি আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে সাইকেলের চেনটা ঠিক করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব।"
অগত্যা তিনজনে মিলে মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে তারা ডাকল, "এই যে, শুনছেন! একটু সাহায্য করবেন?"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।
হঠাৎ পাশের বাঁশঝাড় থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল—খসখস... খসখস...

তারা চমকে উঠে বাঁশঝাড়ের দিকে তাকাল। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পেল না। ভয়ে ভয়ে তারা আবার সামনে ফিরে তাকাল। কিন্তু এ কী! শ্যাওড়া গাছের কাছে সেই সাদা শাড়ি পরা মহিলাটিও আর নেই!

তানিশা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "মহিলাটি কোথায় গেল? একটু আগেও তো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন!"

তিয়াস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "দিদি, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই!"
রাজও আর দেরি করল না। কোনওমতে সাইকেলের চেনটা ঠিক করে তিনজনে সাইকেল নিয়ে প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটল। সেদিন ভয়ে তাদের বুক ঢিপঢিপ করছিল।

বাড়ি ফিরে তারা বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে বাবা-মা হেসে বললেন, "রাতে অন্ধকারে তোমরা হয়তো ভুল দেখেছ। ভয় পেয়ো না, ওসব তোমাদের মনের ভুল।"
কিন্তু তানিশা, তিয়াস আর রাজের মনে সেদিনের ঘটনা আজও গেঁথে রয়েছে। ভূত চতুর্দশীর সেই অন্ধকার রাতের কথা মনে পড়লেই তাদের গা ছমছম করে ওঠে।

সত্যিই কি সেদিন তারা কোনও ভূত দেখেছিল, নাকি সবটাই ছিল অন্ধকারে চোখের ভুল?
সেই প্রশ্নের উত্তর আজও তাদের অজানা!

= = সমাপ্ত = =



যে মেয়েটি হার মানেনি

পিউ মণ্ডল

একটা ছোট্ট শহরে থাকত মেয়ে— নাম তার মেঘলা।

মেঘলার জীবনটা খুব সাধারণ ছিল।
স্বপ্ন ছিল অনেক, কিন্তু সেই স্বপ্নগুলোকে ছুঁয়ে দেখার মতো সুযোগ ছিল খুব কম।

একদিন হঠাৎ তার জীবনে একের পর এক ঝড় এল।

যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত, তাকে হারাল।
যে ভবিষ্যৎটা নিয়ে এত স্বপ্ন দেখেছিল, সেটাও ভেঙে গেল।
চারপাশের মানুষ তার কষ্টটা না বুঝে বলতে লাগল—
"তুমি খুব বেশি ভাবছ।"
"এত জেদ করো কেন?"
"জীবন তো এমনই।"
"সবাই তো মানিয়ে নেয়, তুমিও নাও।"

মেঘলা চুপ করে থাকত।
রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে সে জানালার পাশে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।
তার মনে হতো—
"আমি কি সত্যিই এত দুর্বল?
নাকি আমি শুধু খুব বেশি কষ্ট পেয়েছি?"

একদিন ভোরে সে বাড়ির ছাদে উঠল।
আকাশ তখনও পুরোপুরি আলোয় ভরেনি।
একটা ছোট্ট পাখি বারবার উড়ে এসে কার্নিশে বসছিল, আবার পড়ে যাচ্ছিল।
মেঘলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
পাখিটা বারবার চেষ্টা করছিল।

একবার পড়ল।
দু'বার পড়ল।
দশবার পড়ল।

কিন্তু প্রতিবারই আবার ডানা মেলল।
মেঘলা হেসে ফেলল।
সে পাখিটাকে বলল,
"তুই জানিস না, তোর উড়তে পারার ক্ষমতা আছে?"
পাখিটা অবশ্য কোনো উত্তর দিল না।

শুধু আবার ডানা মেলে আকাশের দিকে উড়ে গেল।
সেদিন মেঘলা একটা কথা বুঝেছিল—
পড়ে যাওয়া আর হেরে যাওয়া এক জিনিস নয়।
সে নিজের চোখের জল মুছে বলল,
"আমার জীবনেও অনেক কিছু আমার ইচ্ছেমতো হয়নি।
কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার সামনে আর কোনো পথ নেই।"
তারপর থেকে মেঘলা একদিনে নিজের জীবন বদলায়নি।
সে প্রতিদিন একটু একটু করে বদলাতে শুরু করল।

যেদিন মন খারাপ হতো, সে নিজেকে বলত—
"আজ শুধু আজকের দিনটা পার করি।"

যেদিন কেউ তাকে ছোট করত, সে বলত—
"তোমার মতামত আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করবে না।"

যেদিন সে ব্যর্থ হতো, সে বলত—
"ব্যর্থতা আমার পরিচয় নয়, এটা আমার শিক্ষার একটা অংশ।"

অনেকদিন পর এক সকালে সে আবার সেই ছাদে দাঁড়াল।
আকাশটা তখন পুরোপুরি পরিষ্কার।
মেঘলা নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝল—
সে আগের মেঘলা নেই।
তার কষ্ট তাকে শেষ করে দেয়নি।
তার কষ্টই তাকে শক্ত হতে শিখিয়েছে।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল—
“জীবন আমাকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে।
কিন্তু আমার কাছ থেকে একটা জিনিস নিতে পারেনি—
আবার শুরু করার সাহস।”
তারপর সে হাঁটতে শুরু করল।
কোথায় যাবে, সে জানত না।

কিন্তু এবার সে জানত—
পথ না থাকলেও পথ তৈরি করা যায়।
আলো না থাকলেও নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালানো যায়।
আর মানুষ যতবারই ভেঙে পড়ুক,
চাইলে ততবারই নতুন করে দাঁড়াতে পারে।



Sayzz Journal

পড়ুন • লিখুন • ভাগ করে নিন

আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।
আপনাদের ভালোবাসা, লেখা, ছবি ও মতামতই
Sayzz Journal-এর পথে চলার প্রেরণা।

আগামী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

আমাদের আগামী সংখ্যার জন্য আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিম্ন নিচ্ছি— গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র, বইয়ের আলোচনা, জীবনভাবনা, কিশোর সাহিত্য এবং আরও নানা ধরনের লেখা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

inbox.sayzz@gmail.com

ইমেইলের বিষয় (Subject)-এ 'Sayzz Journal – লেখা পাঠালাম' লিখে পাঠাবেন। প্রয়োজনে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও যোগাযোগের তথ্য দিন।

আপনার মতামত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

এই সংখ্যাটি নিয়ে আপনার কেমন লাগল?
কি ভালো লাগল, কী আরও ভালো হতে পারে —
জানাতে ভুলবেন না। আপনার পরামর্শ আমাদের পথচলায় নতুন দিশা দেখাবে।

পড়ব, লিখব, ভাবব — একসঙ্গে গড়ে তুলব
আরাও সমৃদ্ধ আগামী সংখ্যা।

সমাপ্ত